ডায়মণ্ড লাইব্রেরীর পক্ষে
শ্রীসাধুচরণ শীল কর্তৃক
প্রকাশিত

মুদ্রাকর :
জি, শীল
ইম্প্রেসন প্রবলেম
২৭এ, তারক চাটার্জী লেন
কলিকাতা ৫

( ঐতিহাসিক নাটক

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

নট্ট কোম্পানীর যাত্রাপার্টিতে অভিনীত

সন ১৩৬০ সাল

একাদশ সংস্করণ ]

# ভূমিকা

—০ঃ*ঃ০—

চাঁদ রায়ের আদরের দুলালী সোনার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী লইয়া নাটকখানি রচিত। যাঁহারা "চাঁদের মেয়ে" পড়িতে গিয়া মানসিংহ ও কার্ভালোকে খুঁজিবেন, তাঁহাদের কাছে আমার বক্তব্য এই, আমি সোনার জীবন-নাট্য লিখিয়াছি, চাঁদ-কেদারের কাহিনী লিখি নাই। সমাজের শাণিত খড়্গাঘাতে হিন্দুনারীর যে অসহায় কান্না আমাদের ধ্বংসের পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহাকেই আমি রূপ দিতে চাহিয়াছি।

কোন কোন ঐতিহাসিক সোনাকে চাঁদের ভগিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ চাঁদ রায়কে কেদার রায়ের পিতা বলিতেও ছাড়েন নাই। সেদিনকার কথা, আজও কেশার মার দীঘিতে, কাচকীর দরজায়, কেদারবাড়ির ধূলিকণায় কেদার রায়ের কীর্ত্তি বিজড়িত, তবু ঐতিহাসিকরা এদের পরিচয় অনুসন্ধান করেন ম্যাকমিলানের পুস্তকালয়ে। বাঙালী এমনি করিয়াই এতদিন ঘরের ঠাকুরকে ফেলিয়া পরের কুকুরটিকে পূজা করিয়াছে। হায়, কবে এই নেতৃত্বের মোহ, আর সমাজের অনাবশ্যক অনুশাসন দূর হইবে? বাঙালীর যে কি ছিল, কি নেই, কেন গেল, আর কি করিয়াই বা ফিরিয়া পাওয়া যায়, এই কথাটাই আজ বুঝানো দরকার।

নাটকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য নট্ট কোম্পানী যে অর্থব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। ইতি—

গ্রন্থকার

# পরিচিতি

## —পুরুষ—

| | | | |
|---|---|---|---|
| চাঁদ রায় | ... | ... | শ্রীপুরাধিপতি। |
| কেদার রায় | ... | ... | ঐ সহোদর। |
| কাঞ্চন ও চম্পক | ... | ... | কেদার রায়ের পুত্র। |
| শ্রীমন্ত | ... | ... | রাজগুরু। |
| দেবল | ... | ... | শ্রীমন্তের জ্ঞাতি-ভ্রাতা। |
| ঈশা খাঁ | ... | ... | সোনারগাঁর দুর্গাধিপতি। |
| এনায়েত | ... | ... | ঈশা খাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু। |

কেশরী, বান্দা, দিলপিয়ার, সনাতন, চাষা, রক্ষী, মাঝি,
রাখালবালকগণ, কৃষকগণ, লাঠিয়ালগণ,
নাগরিকগণ ইত্যাদি।

## —স্ত্রী—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভবানী | ... | ... | চাঁদ রায়ের স্ত্রী। |
| স্বর্ণময়ী | ... | ... | চাঁদ রায়ের কন্যা। |
| কেশার মা | ... | ... | চাঁদ-কেদারের ধাত্রী |
| আলেয়া | ... | ... | ঈশা খাঁর ভগ্নী। |

আলেয়া, গুলবাহার, দাসী, বাঈজীগণ, নাগরিকাগণ,
সেবাদাসীগণ ইত্যাদি।

---

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত জনপ্রিয় নাটক

---

## ছেলে কার ?
দেবেন নাথ

কাল্পনিক নাটক ॥ নব রঞ্জন অপেরায় অভিনীত

## কাঁটার মুকুট
নন্দ চৌধুরী

ঐতিহাসিক নাটক ॥ অম্বিকা নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত

## নীচের পৃথিবী
কমলেশ ব্যানার্জী

সামাজিক নাটক ॥ প্রভাস অপেরায় অভিনীত

## নিয়তির অভিশাপ
কানাই নাথ

কাল্পনিক নাটক ॥ সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত

## লৌহ প্রাচীর
ব্রজেন দে

সামাজিক নাটক ॥ ভারতী অপেরায় অভিনীত

## রক্ত পিপাসা
মণীন্দ্র দে

কাল্পনিক নাটক ॥ নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত

## ক্ষুধিত কঙ্কাল
দেবেন নাথ

ঐতিহাসিক নাটক ॥ শ্রীমা নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত

## ন্যায়দণ্ড
গৌর ভড়

ঐতিহাসিক নাটক ॥ নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত

# চাঁদের মেয়ে

—০:(*):০—

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

কালীগঙ্গার উপকূলস্থ হাওয়াখানা

স্বর্ণময়ীর প্রবেশ।

স্বর্ণময়ী। বিয়ের নামে মেয়েদের প্রাণ নাকি আনন্দে নেচে ওঠে; তবে আমার মনটা এমন কেঁদে কেঁদে উঠছে কেন? কেন এমন স্বপ্ন দেখলুম? কে যেন আমার হাত দুটি ধরে বললে—"স্বর্ণ, আমায় কি ভুলে গেছ?" সে চোখে কি করুণ দৃষ্টি! সে যেন আমার বহু দিনের পরিচিত! তাই তো, কি হলো—কি হলো আমার কোটীশ্বর?

গীতকণ্ঠে সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ।—

গীত

সখি, ফুটলো বুঝি বিয়ের ফুল।
খাবি খাওয়ার শেষ হয়েছে, মিলেছে আজ নদীর কূল।
অকালে তাই বইছে মলয়, কোকিল ডাকে "কু",
দোয়েল শ্যামা পাগল হলো বাঁশীতে দিয়ে ফুঁ,

আজকে শুধু ছড়া, বুকের ব্যথা বাসি মড়া,
আজকে শুধু স্বপ্ন দেখা, পদে পদে বেজায় ভুল॥

স্বর্ণময়ী। না বোন, তোরা যা মনে করেছিস, তা নয়, আমার মন এ বিবাহে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।

১ম সহচরী। ঠমক দেখে বাঁচি নে! আয় লো আয়, নাগরাকে একটু একলা থাকতে দে। [ সহচরীগণের প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। কোটীশ্বর! বুকে বল দাও, মনটা শান্ত কর প্রভু!

নেপথ্যে শ্রীমন্ত। স্বর্ণময়ি!

স্বর্ণময়ী। কে—গুরুদেব নয়? [ অগ্রসর হইয়া ] আসুন—আসুন গুরুদেব!

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

স্বর্ণময়ী। [ প্রণাম করিয়া ] এ কি অভাবনীয় সৌভাগ্য আমার? সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে আমি আজ আপনারই দর্শন কামনা করছিলুম। গুরুদেব! আমি তো বেশ সুস্থ হয়েছি, তবে কাকা আমায় এখনও এই হাওয়াখানায় রেখেছেন কেন?

শ্রীমন্ত। কারণ আছে—তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে।

স্বর্ণময়ী। তার জন্য আমার এই নির্জনবাস প্রয়োজন? যাক—কাকা যা ভাল বোঝেন, তাতেই আমার মঙ্গল, কিন্তু গুরুদেব! বিবাহের নামে কেন আমার মনটা এমন কেঁদে উঠছে?

শ্রীমন্ত। ওটবারই কথা।

স্বর্ণময়ী। পর পর তিন রাত্রি একই স্বপ্ন দেখছি। এক সুন্দর যুবা আমার হাত ধরে যেন সকাতরে বলছে—"স্বর্ণ, আমায় কি তুমি ভুলে গেছ?"

শ্রীমন্ত। হতেই হবে—এ হিন্দুর শাস্ত্র। তারপর তুমি কি স্থির করেছ মা?

স্বর্ণময়ী। আমি আর কি স্থির করবো গুরুদেব? নারী হয়ে জন্মেছি, বিবাহ করতেই হবে; তাব উপর গুরুজনের এ বিধান আমার মঙ্গলেরই জন্য।

শ্রীমন্ত। না স্বর্ণ, এতে তোমার ঘোর অমঙ্গল।

স্বর্ণময়ী। গুরুদেব—

শ্রীমন্ত। তোমার যদি বিবাহ হয়, তোমার পিতৃকুল অনন্ত কালের জন্য নরকস্থ হবে, আমারও পূর্বপুরুষগণ স্বর্গের শান্তির আশ্রয় হতে রৌরব-নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।

স্বর্ণময়ী। আমার জন্য? কেন ব্রাহ্মণ, আমি কি এমন অভাগিনী?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ মা এমনি অভাগিনী। তোমার রূপ আত্মীয়-স্বজনের অভিশাপ—তোমার যৌবন আতঙ্কের স্থল। স্বর্ণ! তুই বিবাহ করিস নে, জগতের ওপর চিরকাল এমনি করে মমতার জাহ্নবীধারার মত বয়ে যা। কি প্রয়োজন মা বিবাহে? আয়, তোকে আমি কোটীশ্বরের পায়ে উৎসর্গ করে দিই! সে বিবাহে বৈধব্য নেই, দাম্পত্য-কলহ নেই; সে স্বামী মরে না, বৃদ্ধ হয় না, জরায় তার দেহে একটা রেখা পড়ে না।

স্বর্ণময়ী। গুরুদেব! কেন আপনি আজ এত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন?

শ্রীমন্ত। চঞ্চল হবো না? চাঁদকে তবু রাজি করিয়েছিলুম, কিন্তু কেদারকে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না, তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

স্বর্ণময়ী। আমি তো তাদের বিরুদ্ধে কথা কইতে পারবো না গুরুদেব।

শ্রীমন্ত। পাববে না? তবে চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হোক?

কেশার মার প্রবেশ।

কেশার মা। হলোই বা, তাতে তোমার কি বামুন? তোমার পাওনা-গণ্ডা পেলেই তো হলো। আরে মলো, কথা নেই, বাত্রা নেই, অমনি এসে দাপাদাপি কবতে লেগেছে। মেয়েটার মুখখানা ভয়ে আমসী হয়ে গেছে গা।

শ্রীমন্ত। কেশাব মা!

কেশার মা। যাও—যাও, পথ দেখ। বাজাব হুকুম মনে আছে?

স্বর্ণময়ী। কি বলছিস কেশাব মা?

কেশাব মা। না দিদি, কিছু না। ভয় কি? ও মিনসে পাগল। কি গো, এখনও দাঁড়িয়ে যে? তবে আয় দিদি, আমরাই এখান থেকে যাই।

শ্রীমন্ত। না—দাঁডাও; স্বর্ণ। আমি তোমার বিবাহ হতে দেবো না।

কেশার মা। কেন গা ঠাকুর, কেন? তোমার বাডা ভাতে ছাই পড়েছে না কি?

স্বর্ণময়ী। ছিঃ-ছিঃ, কেশাব মা! গুরুদেব—

কেশার মা। আমি গুরু-ফুরু মানি না। খবরদার বামুন! যাও বলছি, আর একটা কথা বলবে তো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

স্বর্ণময়ী। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। গুরুদেব! আপনি কি বলতে চান—বলুন, উৎকণ্ঠায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

শ্রীমন্ত। মা স্বর্ণময়ি! তুমি শুধু চাঁদ রায় কেদার রায়ের স্নেহের

প্রতিমা নও, সমস্ত রাজ্যেরই আদরের দুলালী তুমি। তোমার বুকে বজ্রাঘাত করবার পূর্বে আমার নিজেরই মরতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু উপায় নেই; তোমার নিজের মঙ্গলের জন্য, দশের মঙ্গলের জন্য এ আঘাত আজ তোমায় সইতেই হবে। স্বর্ণময়ি! তুমি—

কেশার মা। [ শ্রীমন্তের পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া ] বলো না—বলো না ঠাকুর! আমায় আগে গলা টিপে মার, তারপর যা খুসী বলে যাও। দিদি! পালাই চল, এ বামুন নয়, রাক্ষস!

স্বর্ণময়ী। দোহাই গুরুদেব! যা বলবার শীঘ্র বলুন। আমি কি, বলুন ব্রাহ্মণ, আমি কি?

কেশার মা। না—না বলো না।

শ্রীমন্ত। স্বর্ণ! তুমি—তুমি বিধবা!

স্বর্ণময়ী। গুরুদেব! [ শ্রীমন্তের পদতলে আছড়াইয়া পড়িল ]

কেশার মা। ওঃ! ওরে, একটা বাজ পড়ে না, একটা বাঘ লাফিয়ে আসে না? বামুন! তুই মুখে রক্ত উঠে মর, তোর ছেলে মেয়ে সব মরে হেজে ছাই হয়ে যাক। আমি এখন কাকে ডাকি? কি করি? নচ্ছার! তোর তিন কুল নরকে যাচ্ছে, তাই এ কচি মেয়েটাকে মাথায় পাহাড় ছুঁড়ে মারলি? [ হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ] যা—যা পালা বলছি, নইলে আমি তোর মাথাটা চিবিয়ে খাবো। ওঠ দিদি, কাঁদিস নে। সে কোন কালের কথা, কারও মনেও নেই। আবার তোর বর আসবে, তোকে মাথায় করে রাখবে।

স্বর্ণময়ী। কোথায় আমার বিবাহ হয়েছিল? কার সঙ্গে?

শ্রীমন্ত। চন্দ্রদ্বীপের রাজার সঙ্গে।

কেশার মা। [ হাত নাড়িয়া ] ওঃ—ভারী বড়মুখ করে বলতে এলেন! গুরু!—মুখে আগুন অমন গুরুর!

শ্রীমন্ত। কেশার মা!

কেশার মা। দাঁড়াও, রাজবাড়ী গিয়ে তোমার ছেরাদ্দর জোগাড় করছি।

শ্রীমন্ত। মা!

স্বর্ণময়ী। যান গুরুদেব, এ অশুচি অবস্থায় আজ আর প্রণাম করবো না। ভয় নেই, স্বামীর অবমাননা আমি করবো না।

শ্রীমন্ত। তোমার কল্যাণ হোক।

[ প্রস্থান।

কেশার মা। দিদি! কথা ক, কেন চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছিস? ওরে, আমার যে বুকটা ফেটে যাচ্ছে!

স্বর্ণময়ী। আমায় এতদিন এ কথা কেউ বলেনি কেন?

কেশার মা। রাজার বারণ ছিল, তা ছাড়া দেশের লোক সবাই তোমায় ভালবাসে, কে তোমার মাথায় বাজ হানবে দিদি।

স্বর্ণময়ী। ভগবান—ভগবান! আমি একটা তুচ্ছ নারী, আমায় নিয়ে একি লীলা তোমার? আর যত বজ্র আছে—এক সঙ্গে হানো, আমি সব সইবো—সব সইবো। ওঃ—এই কুমারীর বেশ আমার কাছে আজ বিশ্বের ভার বলে মনে হচ্ছে। কেশার মা। আমি তাকে দেখেছি, সে সুন্দর মুখ আমি যেন জন্ম জন্ম বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি! এ দেহটাই অশুচি হয়ে গেছে। এতদিন তিনি আমার কাছছাড়া, তবু একদিনও আমি তার স্মৃতির তর্পণ করিনি, বৈধব্যের অপমান করে হয় তো আমি তাঁকে নরকস্থ করেছি। প্রায়শ্চিত্ত করবো, ওই যে অলিন্দের নীচে কালীগঙ্গার জলকল্লোল আমায় ডাকছে! কালীগঙ্গা! বাহু বাড়িয়ে আয়, আমি তোকে আলিঙ্গন করি!

[ উন্মাদিনীর মত প্রস্থান।

কেশার মা। সোনা—সোনা—[ প্রস্থানোদ্যতা ]

কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। কেশার মা—কেশার মা !

কেশার মা। দাদু এসেছ ? ভালই হলো। দেখ তো দাদা, আমি কি বিপদে পড়েছি !

কাঞ্চন। চুলোয় যাক তোর বিপদ। সোনা কোথায় ?

কেশার মা। ওই যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ দাদা, বারান্দার নীচে দিয়ে কার বজরা যাচ্ছে ?

কাঞ্চন। ঈশা খাঁর ; শ্রীপুরে এসেছিল, ফিরে যাচ্ছে। তাকে তুলে দিয়েই আমি এখানে আসছি। ডাক—ডাক, সোনাকে ডাক—

কেশার মা। ঈশা খাঁ ? সে তো মস্ত লোক। তা পোড়ামুখো মিনসে সোনার দিকে অমন হাঁ করে তাকাচ্ছিল কেন ?

কাঞ্চন। তাই না কি ? তা তাকাবে না ? বোনটি আমার যে ভুবনমোহিনী।

কেশার মা। ওরে, তাই তো দুঃখে বুক ফেটে যায়। এমন লক্ষ্মী-পিতিমের কপালে পোড়ার মুখো ভগবান কি এই লিখেছিল ?

কাঞ্চন। আ মর মাগী, প্যানপ্যানাতে শুরু করলে দেখ ! সোনা—সোনা !

স্বর্ণময়ীর পুনঃ প্রবেশ।

কাঞ্চন। বা রে বাঁদরি, মুখখানা যে তোলা হাঁড়ী করে ফেলেছিস ! বাঃ—আবার কাঁদছে দেখ ! আরে, কি হলো তোর ?

কেশার মা। হবে আমার মাথা ; ও আজ সব জানতে পেরেছে।

কাঞ্চন। সব জানে ?

কেশার মা। তোদের গুরুঠাকুর আজ ওকে বলে গেছে, ও বিধবা।

কাঞ্চন। ব্যাটা আবার এখানে এসেছিল? যাক, তাতে আর হয়েছে কি? তুই তা বলে কাঁদিসনি সোনা? কাঁদিসনি—কাঁদিসনি চল, বাবা তোকে নিয়ে যেতে আমায় পাঠিয়েছেন।

স্বর্ণময়ী। তবে আমার মৃতদেহটাই নিয়ে যাও; এ অশুচি দেহ আমি কালীগঙ্গাব জলে বিসর্জন দেবো।

কাঞ্চন। অশুচি মানে? তোর কি তাকে মনে আছে, না তার ঘব করেছিস?

স্বর্ণময়ী। তুমিও তাহলে সব জান দাদা? আমায় এতদিন একথা বলনি কেন?

কাঞ্চন। আরে, বলবো আবাব কি? সে কোন সত্যযুগে তোর বিয়ে হয়েছিল, ছ'মাসের মধ্যে সে শালা পটল তুললে। দেখা নেই—শোনা নেই—ঘরকন্নাব নামগন্ধ নেই; তাকে কি আর বিয়ে বলে? কি বলিস কেশার মা? অমন বিয়ে তো তোর সঙ্গে আমার দিনে দশবার হয়।

কেশার মা। তাই তো বলছি দাদা, কিন্তু ও কিছুতেই বোঝে না।

কাঞ্চন। সে যা হয় হবে, এখন বাড়ী চল।

স্বর্ণময়ী। আমি যাবো না।

কাঞ্চন। বাবার অবাধ্য হবি? তবে থাক, আমি চললুম—

স্বর্ণময়ী। দাদা!—আচ্ছা, চল—

[ সকলের প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদের একাংশ

চাঁদ রায় ও কেদার রায়।

চাঁদ। না কেদার, তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর; বিধবার বিবাহে আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।

কেদার। বিধবা তুমি কাকে বলছো দাদা? শৈশবের এক অশুভ মুহূর্তে তার কচি হাত দুটী অন্যের হাতে তুলে দিয়েছিলে; স্বামীকে সে চিনলে না—জানলে না—দুটো দিন স্ত্রীর কর্তব্য পালন করলে না, তবুও তারই অকালমৃত্যুতে এই বালিকার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে?

চাঁদ। হিন্দুশাস্ত্রের এই-ই যে নিয়ম ভাই!

কেদার। শাস্ত্র তো তোমার আমার গড়া, বিধাতার গড়া তো না দাদা! মানুষের প্রয়োজনে যে শাস্ত্র গড়ে উঠেছে, আজ মানুষেরই প্রয়োজনে সে শাস্ত্র ভাঙ্গতে হবে।

চাঁদ। না কেদার; হিন্দুর বিবাহের মন্ত্র অত ভঙ্গুর নয়।

কেদার। বিবাহের মন্ত্র? দাদা! তুমি যখন কন্যা সম্প্রদান করেছিলে, তখন বিবাহের মন্ত্র পাঠ করেছিলে তুমি—তোমার কন্যা তার জন্য দায়ী নয়।

চাঁদ। কেদার! আমরা মাটির পৃথিবীতে বাস করি; স্বপ্ন-রাজ্যের কল্পনা নিয়ে আমাদের বাস করা চলবে না। তুমি শাস্ত্রকে অন্যথা করতে পার, কিন্তু মানুষের বুকের উপর জগদ্দল পাহাড়ের মত যে গুরুভার চেপে আছে, সে যুক্তি বোঝে না—ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারে না, তার নাম সমাজ।

কেদার। সমাজ তুমি, সমাজ আমি। রূপোর চাকতি দু'হাতে বিলিয়ে দাও, সমাজ এসে তোমার পায়ের তলায় গড়িয়ে পড়বে। আর সমাজ যদি আমাদের ত্যাগই করে, করুক। দাদা! শৈশবে কন্যার বিবাহ দিয়ে যে মহাপাপ করেছ, তার শাস্তি একটুও ভোগ করবে না। তুমি পুরুষ বলে চিরদিন সোনার থালায় রাজভোগ খাবে, আর তার অদৃষ্টে পর্ণপুটে ভিক্ষান্নও জুটবে না? ভাবতে লজ্জা হয়, কামিনী-কাঞ্চনের মহিমায় আজও আমাদের ভোগের থালা ষোড়শোপচারে সাজানো, আর আমাদেরই এক ননীর পুতুল উপবাসে অর্ধাশনে—

চাঁদ। কেদার!—কেদার!

কেদার। না দাদা, আমায় বোঝাতে পারবে না, আমি বুঝবো না—কিছুতেই বুঝবো না। অনেক দূর এগিয়েছি, আমি সোনার বিবাহ দেবোই; তারপর যদি ইচ্ছা হয়, তুমি আমায় দণ্ড দিও।

চাঁদ। কেদার! তরুণী কন্যার বৈধব্য পিতার বক্ষে যে দাবানল জ্বেলে দেয়, তুমিও তা ঠিক বুঝতে পারবে না। ঐশ্বর্যের শত আড়ম্বরের মধ্যে সে আমার চির-উপবাসী রয়ে যাবে, ভোগের সহস্র অগ্নিশিখার মাঝখানে আমার সে লক্ষ্মী-প্রতিমা কঠোর বৈরাগ্যের কশাঘাত সহ্য করে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাবে, উদ্বেলিত মহাসাগর তার বুকের মধ্যে দিবানিশি ত্যাগের বাড়বানল জ্বেলে রাখবে, এ যে কি দুঃসহ জ্বালা, আমি তোমায় তা বোঝাতে পারবো না। রক্ত-মাংসের আবরণ দিয়ে এখানে কি যে সাহারার মরু লুকিয়ে রেখেছি, ভাষা তাকে রূপ দিতে পারে না।

কেদার। তবে আর সমাজের দোহাই দিও না দাদা! অবশ্য তুমি সমাজপতি, ঠিক এক অপরাধেই অপরকে তুমি দণ্ড দিয়েছ।

চাঁদ। ওইখানেই যত বাধা কেদার! যার জন্য প্রজাদের দণ্ড দিয়েছি, নিজে তা কেমন করে করবো?

কেদার। কিন্তু আমি তো সমাজ মানি না; আমি যদি বিবাহ দিই?

চাঁদ। পারিস ভাই, পারিস? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—জোর করে? সমাজ যদি দণ্ড দেয়, সইতে পারবি?

কেদার। সোনার সুখের জন্য আমি মৃত্যুদণ্ডও সইতে পারবো।

চাঁদ। ভাই। ভাই! তবে নিয়ে যা—চুরি করে নিয়ে যা এমন স্থানে, যেখানে চাঁদের আলোক পৌছায় না। যা, নিয়ে যা!

**গীতকণ্ঠে সনাতনের প্রবেশ।**

**গীত**

খবরদার—খবরদার—খবরদার।
ওই দেখ [illegible] নরকদ্বার॥

চাঁদ। কে তুমি?

সনাতন।— **পূর্ব গীতাংশ**

আমি বেদবিধি, আমি যে সমাজ আমি সনাতন ধর্ম,
রয়েছি ঘিরিয়া, সদাই তোদের আমারি লৌহবর্ম
আমি বন্ধনের ঘন গিরি হিমালয়, সাহারার মত আমি জ্বালাময়
আমারি দণ্ডে রয়েছে মিশিয়া মঙ্গল সবাকার॥

[ প্রস্থান।

কেদার। আবার এসেছ? না—আজ আর আমি তোমায় ক্ষমা করবো না।

[ উন্মুক্ত তরবারিহস্তে প্রস্থান।

চাঁদ। কোটীশ্বর! উপায় কর দেব, অকুলপাথারে পথ দেখিয়ে দাও—[ প্রস্থানোদ্যত ]

"বাবা—বাবা! বলিতে বলিতে স্বর্ণময়ী ছুটিয়া আসিয়া চাঁদের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

চাঁদ। সোনা আমার—লক্ষ্মী আমার। কেন মা এমন করে এলি?

স্বর্ণময়ী। বাবা! কেন আমায় এতদিন বলনি?

চাঁদ। কি মা? কি হয়েছে মা?

স্বর্ণময়ী। কেন আমায় বলনি যে, আমি বিধবা।

চাঁদ। এঁ্যা! কি—কি? কার কাছে শুনেছিস—মিছে কথা— [ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ]

স্বর্ণময়ী। বাবা! তুমি না সত্যবাদী? তবে আমার জীবনটাকে এমন মিথ্যার জাল দিয়ে জড়িয়ে রেখেছ কেন?

চাঁদ। ওরে, কে এমন নিষ্ঠুর, যে তোর বুকে এমন বাজ হানলে? আমি যে এতদিন লোকের কুটিল দৃষ্টি থেকে তোকে গোপন করে রেখেছিলুম। আমি নিজে উপবাসী থেকে দু'হাত পুরে ভোগৈশ্বর্য রাজ্যময় বিলিয়ে দিয়েছি, আর আমার এতটুকু শান্তি তাদের সইলো না? তারা তোর কচি মুখখানার দিকে চাইলে না? এই শ্রীপুরের বুকে দাঁড়িয়ে অনায়াসে বললে, তুই বিধবা?

কেদার রায়ের প্রবেশ।

কেদার। [ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ক্রোধে হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল ]

স্বর্ণময়ী। বাবা! আমায় বিদায় দাও। হিন্দুর বিধবা আমি; এতদিন বৈধব্য আচরণ না করে যে মহাপাপ করেছি, কালীগঙ্গার জলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করবো।

চাঁদ। শুনছো কেদার, শুনছো? এত দুঃখ কি মানুষ সইতে পারে?

কেদার। সোনা—

[ স্বর্ণময়ী ছুটিয়া কেদারের কাছে গেলেন, কেদার পরম স্নেহে তাহার মুখখানা বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার চোখের অজস্র অশ্রুধারা স্বর্ণময়ীর মাথায় পতিত হইল ]

চাঁদ। দেখ—দেখ কেদার, একদিনে সোনার প্রতিমা কালি হয়ে গিয়েছে। কি করবে কর, আমি আর ভাবতে পারছি না। আমার মাথা ঘুরছে—পায়ের তলা থেকে পৃথিবী সরে যাচ্ছে!

কেদার। দাদা—

চাঁদ। আর কি বোঝাবে কেদার? তোমাদের সমস্ত যুক্তি-তর্কের কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে ওই একফোঁটা মেয়ে।

কেদার। কিছুই হয়নি দাদা। কুমারী বলে বিবাহ দেবো ভেবেছিলুম, তা যখন হলো না, বিধবা বলেই বিবাহ দেবো।

স্বর্ণময়ী। কাকা! যা বলেছ—বলেছ, বলো না, ও কথা শোনাও মহাপাপ।

কেদার। যত পাপ আমরা ছাপ মেরে নেবো, নরকে যাই—আমরা যাবো, তবু তোর জীবন সার্থক হোক।

স্বর্ণময়ী। কিসে আমার জীবন সার্থক হবে কাকা?

কেদার। বিবাহে—মাতৃত্বে।

স্বর্ণময়ী। ছিঃ-ছিঃ! কাকা! আমার বৈধব্যের অপমান করো না।

কেদার। ভুলে যা—ভুলে যা। যা শুনেছিস, সে অতীতের স্বপ্ন। সারা জীবনের অশ্রান্ত চেষ্টায় আমরা দু'ভাই যে রাজ্য গড়ে তুলেছি, সব পথের ধুলোয় ছড়িয়ে দিয়ে বৃক্ষতলে বাস করবো, তবু তুই সুখী হ।

স্বর্ণময়ী। না কাকা, তা হয় না। আজ প্রথম আমি তোমাদের অবাধ্য হবো। হয় আমাকে মরতে দাও, না হয় বিধবার সাজে সাজিয়ে দাও—

চাঁদ। না—না—না! আমরা যে কদিন আছি, সে কটা দিন এই ভাবেই থাক; আমরা মরে গেলে যা ইচ্ছা করিস।

স্বর্ণময়ী। না বাবা, এ বিয়ের বোঝা আর এক মুহূর্তও বইতে পারবো না। [ একে একে সমস্ত আভরণ ত্যাগ করিলেন, চাঁদ রায় দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, কেদার রায় স্তম্ভিত হইয়া স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন ]

[ স্বর্ণময়ী নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন।

চাঁদ। কেদার!—

কেদার। দাদা! চাঁদ রায় কেদার রায়ের আদেশ অমান্য করে এ বিক্রমপুরে এমন সাহস কার? কে বললে সোনাকে যে, সে বিধবা?

কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। শ্রীমন্ত।

চাঁদ। গুরুদেব?

কেদার। বেঁধে নিয়ে এসো—

কাঞ্চন। আসছে; জানি তার খোঁজ পড়বে, তাই আমি তাকে ডেকে এনেছি; বাবা! আমি ওই বামুনের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবো, তার ছেলে মেয়েগুলোকে গলা টিপে ঠাণ্ডা করে দেবো। মহারাজ! আপনার চোখে জল? ছিঃ-ছিঃ! মহাবীর চাঁদ রায়ের চোখে জল দেখলে লোকে বলবে কি? ভয় কি মহারাজ? আবার সোনার বিয়ে দিন; কেউ যদি কোন কথা বলে, আমি তার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবো।

চাঁদ। কাঞ্চন! আমার বুকটা চেপে ধর তো, বুঝি এখনি ফেটে যাবে।

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। মহারাজ চাঁদ রায়ের জয় হোক।

চাঁদ। গুরুদেব। আপনি কি করলেন?

শ্রীমন্ত। কি করেছি চাঁদ?

কেদার। কি করেছেন? ব্রাহ্মণ! চাঁদ রায়ের আদেশের মূল্য আপনি জানেন; তবে কিসের স্পর্দ্ধায় তার আদেশ অমান্য করে আপনি তাঁর তরুণী কন্যার মাথায় এ বজ্রাঘাত করলেন?

চাঁদ। আপনার বুকে একটু বাজলো না?

কাঞ্চন। কি, জবাব দিন—

শ্রীমন্ত। থাম রে বাপু! রাজা! এ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। আমি তোমার কুলগুরু; সাত পুরুষ ধরে আমরা তোমাদের বংশের শুভাশুভের দায় গ্রহণ করে আসছি। চোখের উপর যখন দেখলুম, তোমাদের মমতার মোহে চতুর্দ্দশ পুরুষ নিরয়গামী হতে চলেছে, অথচ তোমাদের তা বোঝাতে পারছি না, তখন নিরুপায় হয়ে স্বর্ণময়ীকে বলেছি—

কেদার। যে, তুমি বিধবা। উচ্চারণ করতে পারলেন? জিহ্বাটা আড়ষ্ট হয়ে গেল না? চতুর্দ্দশ পুরুষ নিরয়গামী হবে?

কাঞ্চন। তাতে তোমার কি ঠাকুর?

কেদার। যাক, এ পাপের শাস্তি আপনাকে নিতে হবে।

শ্রীমন্ত। পাপ? পাপ করেছিলে তোমরা, আমি তোমাদের সে পাপ থেকে রক্ষা করেছি। চাঁদ—

কেদার। ওদিকে নয় ব্রাহ্মণ, ওখানে আছে অনন্ত দয়া; বিচার-সভা এইখানে—[ নিজের বুকে হাত দিলেন ] ব্রাহ্মণ! আমি চাঁদ রায় নই, আমি মাটির মানুষ, আমি তোমার বিচার করবো।

শ্রীমন্ত। আমার বিচার?

চাঁদ। না কেদার, যেতে দাও।

কেদার। আমি কোন কথা শুনবো না দাদা! সব সইতে পারি আমি, কিন্তু সোনার জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিতে যে একটা নিঃশ্বাসও ফেলবে, গুরু হলেও তাকে আমি ক্ষমা করবো না।

কাঞ্চন। হত্যা কব—নৃশংস হত্যা।

চাঁদ। কেদার—কেদার! এ ব্রাহ্মণ—

কেদার। ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, রাজার অনুরোধে তোমায় অন্য কোন দণ্ড দিলুম না; কিন্তু আজ হতে আমরা গুরু ত্যাগ করলুম।

শ্রীমন্ত। গুরুত্যাগ! বিনা অপরাধে? রাজা তোমারও কি এই মত?

চাঁদ। কেদার—কেদার—

কেদার। দোহাই দাদা, পায়ে ধরি তোমার, প্রতিবাদ করো না। কেদার রায়ের হাতে এমন গুরু পাপে লঘু দণ্ড কেউ পায়নি।

চাঁদ। তবে আর কি করবো ব্রাহ্মণ, আমি নিরুপায়।

শ্রীমন্ত। রাজা! আমি আজীবন একান্তমনে তোমার গৃহ-দেবতার পূজা করে আসছি, তার এই ফল? একটা তুচ্ছ দেবমন্দিরের পৌরোহিত্য করে কত ব্রাহ্মণ ধনরত্নে গৃহ পূর্ণ করেছে, আর আমি, চাঁদ রায়ের গুরু, আমার ভাঙ্গা ঘরে আষাঢ়ের জল গড়িয়ে পড়ে। তার কি এই ফল? কতদিন গৃহে অন্নাভাবে আমার স্ত্রী-পুত্র উপবাসে ছটফট করেছে, আর আমি কোটীশ্বরের পূজায় আত্মহারা হয়ে সন্ধ্যায়

গৃহে ফিরেছি। তুমি দুহাতে দান করতে চেয়েছ, আমি নিইনি; তার কি এই ফল?

কাঞ্চন। কথা কয়ো না ঠাকুর! যাও—এখনি দূর হও!

শ্রীমন্ত। রাজা—

কেদার। যাও—যাও!

শ্রীমন্ত। যাচ্ছি; যাবার সময় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তোমাদের উপহার দিয়ে যাচ্ছি। এই গুরুত্যাগ ধর্মে সইবে না। আমি যদি মনে প্রাণে এতদিন তোমাদের মঙ্গলকামনা করে থাকি; তা হলে আজ আমার এই দীর্ঘনিঃশ্বাসে তোমাদের জীবনের সুখ-শান্তি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

[ প্রস্থান।

চাঁদ। কাজটা ভালো হলো না কেদার! সপ্ত পুরুষের গুরু—

কেদার'। না দাদা, এমন শাস্ত্রবিদ গুরু আমাদের সইবে না। একজন নিরক্ষর গুরু চাই, যার প্রাণ আছে।

কাঞ্চন। এই শ্রীপুরেই তেমন লোক আছে বাবা! আমি খবর পাঠাচ্ছি! আর একটা কথা বাবা! ও বামুনটাকে একঘরে করতে হবে, নইলে ওর বিষ-দাঁত ভাঙবে না।

[ প্রস্থান।

চাঁদ। একদিনে একটা সোনার সংসারের উপর দিয়ে কি প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস বয়ে গেল, জগৎ তার সন্ধান রাখে না। কেদার! কি করলুম এত দিন! ভুল—সব ভুল! কি দুর্বল এই মাটির মানুষ কেদার!

কেদার। ও কে? দাদা! চোখ বুজে থাকো, তুমি সইতে পারবে না।

ধীরে ধীরে শুভ্রবাস-পরিহিতা শুচিস্নাতা স্বর্ণময়ীর প্রবেশ, পশ্চাতে চম্পক।

স্বর্ণময়ী। বাবা! আমার নবজীবনের প্রভাতে তোমাদের ~~প্রণাম করছি~~। আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছি

কেদার। সোনা—সোনা! ওঃ—

চাঁদ। চুপ—চুপ, কেদার! কথা কস নে, এ বড় পবিত্র দৃশ্য! শান্তি এসে বিষাদের হাত ধরেছে, বৈরাগ্যের শুষ্ক মরুভূমির উপর সঙ্গীতের জাহ্নবীধারা বয়ে যাচ্ছে, যজ্ঞের হোমাগ্নির মধ্যে চন্দনচর্চিত বিল্বপত্র এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। কেদার। এ মহাতীর্থ, এখানে একটা নিঃশ্বাসও ফেলিস নে।

স্বর্ণময়ী। এইবার গাও ভাই, তোমার সেই গান, তোমার দেবতার পায়ে আমাকে উৎসর্গ কর।

চম্পক।—

**গীত**

ওগো, প্রেমময় বনমালি।
তোমারি চরণে আমার এ জীবন আনিয়াছি দিতে ডালি।
আলেয়ার পিছে বৃথা আশ্বাসে ঘুরেছি কত যে হায়,
মিটে নাই আশা, কণ্টক শত ফুটিয়াছে পায় পায়,
সকল হারায়ে আজি লাভে মূলে, আসিয়াছি প্রিয় তব পদমূলে,
আবার এ পথ, দেখাও আলোক নয়ন-প্রদীপ জ্বালি।

[ স্বর্ণময়ীর হাত ধরিয়া চম্পকের প্রস্থান, তৎপরে নীরবে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের প্রস্থান। ]

———

## তৃতীয় দৃশ্য

সোনার গাঁ—ঈশা খাঁর প্রাসাদ

ঈশা খাঁ ও এনায়েৎ।

ঈশা খাঁ। না এনায়েৎ, আমায় প্রলোভন দেখিয়ো না। চাঁদ রায়ের সঙ্গে আমার স্নেহের সম্বন্ধ তুমি বোধ হয় জান না এনায়েৎ! অমন নিষ্ঠাবান হিন্দু—তাঁর অন্তঃপুরে আমায় অবাধে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন, আমি যখনই তার কাছে গিয়েছি, তিনি নির্বিচারে আমায় আলিঙ্গন করেছেন, তার কন্যার সম্বন্ধে একথা মনে করাও আমার মহাপাপ।

এনায়েৎ। কিসেব পাপ বন্ধু? আবহমান কাল হতে মানুষ রূপের পূজা করে আসছে—

ঈশা খাঁ। কিন্তু আমি তা করবো না; ঈশা খাঁ রূপের পূজার চেয়ে তরবারির পূজা বেশী ভালোবাসে।

এনায়েৎ। কিন্তু তোমার চোখের ভাষা তো তা নয় ঈশা খাঁ! শ্রীপুর থেকে এসে তুমি যেন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছ। তোমার হৃদয় সিংহাসন জুড়ে কে বসে আছে, আমি তা দেখতে পাচ্ছি, সে চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী।

ঈশা খাঁ। কে বললে? না-না, মিথ্যা কথা। এ হতে পারে না। খোদা—খোদা! বুকে পাষাণ চাপিয়ে দাও—হৃদয়টাকে পুড়িয়ে মরুভূমি করে ফেল! এনায়েৎ! কোন যুদ্ধের সংবাদ আছে? আমি একবার ছুটতে চাই—রণভেরীর তালে তালে একবার নৃত্য করতে চাই।

এনায়েৎ। আপাততঃ কোন যুদ্ধের সংবাদ নেই।

ঈশা খাঁ। নেই? একটা যুদ্ধ বাধিয়ে দাও, যার সঙ্গে হোক—

যে কারণে হোক! জয় চাই না—পরাজয় চাই, লাভ চাই না—লোকসান চাই, মাথা নেবো না এনায়েৎ—মাথা দেবো।

এনায়েৎ। ছিঃ, ঈশা খাঁ! নারীর মত তুমি এত দুর্বল? আমি বলছি, চাঁদ রায়ের কন্যাকে খোদা তোমারি জন্য সৃষ্টি করেছেন। তুমি দেখনি সে চক্ষের বিলোল কটাক্ষ? মনে নেই, তোমার দিকে চেয়ে তার সেই দরবিগলিত অশ্রুধারা?

ঈশা খাঁ। কে বললে? না—না, সে তো আমার দিকে চায়নি!

এনায়েৎ। তুমি ভুল বুঝছ। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, তার সেই অশ্রুজল তোমারই জন্য।

ঈশা খাঁ। এনায়েৎ—এনায়েৎ! আমায় পাগল করো না।

এনায়েৎ। তুমি বীর—তুমি যোদ্ধা; এক তরুণী তোমার পায়ে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে চায়, তুমি তাকে গ্রহণ করবে না? এতটুকু সাহস নেই তোমার? এই বীরত্ব নিয়ে তুমি স্বাধীন রাজা হতে চাও?

ঈশা খাঁ। তাই তো এনায়েৎ, এ যে বিষম সমস্যা?

এনায়েৎ। সমস্যা কিছুই নয় বন্ধু! তুমি শুধু চাঁদ রায়ের কন্যার পাণিপ্রার্থনা করে একখানা পত্র লিখে দাও, আমি নিজে তাই নিয়ে শ্রীপুর যাত্রা করছি—

ঈশা খাঁ। হিন্দু-মুসলমানে বিবাহ? না এনায়েৎ, চাঁদ রায় রাজী হবে না।

এনায়েৎ। সে ভার আমার।

ঈশা খাঁ। কিন্তু তোমার এতে স্বার্থ?

এনায়েৎ। স্বার্থ? [ একটু হাসিয়া ] শুধু তোমার মুখের হাসি।

ঈশা খাঁ। এনায়েৎ! পূর্বজন্মে বোধ হয় তুমি আমার ভাই ছিলে; নইলে এতখানি স্নেহ—

এনায়েৎ। যাক, পত্রখানা দাও!

ঈশা খাঁ। পত্র আমি লিখে রেখেছিলুম বন্ধু! এই নাও—[ পরিচ্ছদের মধ্য হইতে পত্র বাহির করিয়া এনায়েতের হস্তে দিলেন, পত্র পড়িয়া এনায়েৎ প্রস্থান করিলে ঈশা খাঁ পুনরায় ডাকিলেন ] এনায়েৎ!

এনায়েতের পুনঃ প্রবেশ।

ঈশা খাঁ। না, থাক, কাজ নেই বন্ধু! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এ পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ রায়ের চিরবিশ্বাসী মনটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে—কেদার রায়ের দু' চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটবে—সমস্ত হিন্দুসমাজ ঈশা খাঁর নামে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করবে। না এনায়েৎ, জগৎ জানে—ঈশা খাঁ বাংলার সুসন্তান, মুসলমান জানে—ঈশা খাঁ তাদের বাহুবল, হিন্দুরা জানে—আমি তাদের সুখ-দুঃখের সাথী। এত বড় বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে আমি রূপের পূজা করতে চাই না। অনন্ত কাল আমি স্মৃতির দাহে জ্বলে মরবো—সেও ভাল তবু মানুষের ঘৃণার পসরা তুলে নিতে পারবো না।

এনায়েৎ। [ পত্র ফেরত দিতে দিতে ] এই তোমার বীরত্ব? এক নারী তার সর্বস্ব তোমায় সমর্পণ করে বসে আছে—

ঈশা খাঁ। এনায়েৎ!—আচ্ছা যাও, আর ভাবতে পারি না। [ এনায়েতের প্রস্থান ] এনায়েৎ—এনায়েৎ! চলে গেছে। খোদা! খোদা! কি করলুম? [ অবসন্নভাবে আসনে উপবেশন করিলেন। আমি কি সেই ঈশা খাঁ, সমস্ত বাংলা দেশ যার নামে শ্রদ্ধায় শির নত করে, একদিন যে মানসিংহের জীবন রক্ষা করতে স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার করেছিল? না, মরে গেছে সে ঈশা খাঁ—রমণীর রূপের জ্বালায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। হায় রমণীর রূপ!

গীতকণ্ঠে বাঈজীগণের প্রবেশ।

বাঈজীগণ।—

গীত

বঁধু! এই রূপের জালে—
কত যে কাৎলা পোনা, যায় না গোণা, প'ড়েছে পালে পালে।
রূপসীর রূপসায়রে কত রাজ্য তলিয়ে গেল,
কত ফকির ফকিরি ছেড়ে আপন ঘরে ফিরে এল,
ঢেলে দাও—গা ঢেলে দাও, স্রোতের টানে যাও ভেসে যাও
দোজাকের দরজা খোলা, যা থাকে কুলকপালে।

[ প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। রূপের জাল! হ্যাঁ—জালই বটে।

আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। দাদা! এনায়েৎ খাঁকে কোথায় পাঠাচ্ছ?

ঈশা খাঁ। তোমায় কে বললে?

আলেয়া। কেউ বলেনি, আমি গুণতে জানি। দাদা! এ চাঁদ ধরবার আশা ত্যাগ কর।

ঈশা খাঁ। চাঁদ ধরবার আশা। কেন আলেয়া?

আলেয়া। কেন? সব বোঝ, আর সোজা কথাটা বোঝ না? তুমি মনে করছো, তোমার মত সুপাত্র বাংলায় নেই, কিন্তু আমি বলছি, চাঁদ রায়ের কন্যার পক্ষে তুমি অতি কুপাত্র।

ঈশা খাঁ। কুপাত্র? আমি বাংলার বীর ঈশা খাঁ—

আলেয়া। তুমি যদি ঈশা খাঁ, সেও চাঁদ রায়। কিসের লোভ তুমি তাকে দেখাবে দাদা? ঐশ্বর্য্য, রূপ, বীরত্ব? এ সবই চাঁদ

রায়ের বংশে ভগবান অজস্র ঢেলে দিয়েছেন, তুমি দর্পভরে দাবী করবে, সে ভিক্ষুকের প্রার্থনা বলে অট্টহাসি হেসে চলে যাবে।

ঈশা খাঁ। না আলেয়া, চাঁদ রায়ের এত সাহস হবে না।

আলেয়া। তুমি ভুল বুঝেছ দাদা! চাঁদ রায় তো রাজা; হিন্দু-সমাজের এমন ভীষণ অনুশাসন যে, তুমি আজ তোমার অনন্ত রূপ, অনন্ত ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখিয়ে দীন ভিক্ষুকের কাছে তার কন্যার পাণিপ্রার্থনা কর, সে গোখরো সাপের মত গর্জে উঠবে। কি করে এ কামনা তোমার মনে এলো দাদা? তুমি বিবাহিত বিধর্মী—

ঈশা খাঁ। ধর্ম নিয়ে তো জন্মাইনি আলেয়া! আমি ধর্মের প্রভেদ বুঝি না; আমি মানি এক ধর্ম—সে মানুষের ধর্ম।

আলেয়া। মিথ্যা কথা।

ঈশা খাঁ। আলেয়া!

আলেয়া। তা যদি না হবে, পিতা মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে আমাকে কেন স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছ? আমার স্বামী রাজপুত, কেন আমায় তার কাছে যেতে দিচ্ছ না?

ঈশা খাঁ। তোকে ছেড়ে কাকে নিয়ে থাকবো বোন? [ সস্নেহে আলেয়াকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন ] আমায় বিশ্বাস কর দিদি! আমি বহুদিন তার সন্ধান করেছি, কিন্তু সে নিরুদ্দেশ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেও আমাদের জানে না—আমরাও তাকে চিনি না। তুই ভাবিসনে দিদি! যেমন করে হোক তাকে খুঁজে এনে তোদের এইখানেই প্রতিষ্ঠা করবো। এই প্রাসাদের অর্ধেক হবে হিন্দুর, অর্ধেক হবে মুসলমানের, মুসলমানের মসজিদের পার্শ্বে হিন্দুর মন্দির মাথা তুলে উঠবে; মুসলমানের কোরাণের সঙ্গে হিন্দুর গীতা সমস্বরে উচ্চারিত হবে, মুসলমানের তেজস্বিতার সঙ্গে হিন্দুর কোমলতা মিশে একটা

নূতন জীবনের ধারা বাংলার মাটিতে বয়ে যাবে, এই আমার জাগ্রতের স্বপ্ন।

আলেয়া। দাদা!

ঈশা খাঁ। একটা হীন জাতিভেদ এই বাংলা দেশটাকে দুষ্ট কীটের মত জীর্ণ করে ফেলছে। আমি এই জাতিভেদের মূলোচ্ছেদ করে একটা মানুষের জাতি গড়ে তুলবো।

আলেয়া। তোমার স্বপ্ন সফল হবে না দাদা! এই জাতিভেদ বাংলার মজ্জাগত সংসার; এ বাংলার কলঙ্ক—বাংলার গৌরব।

ঈশা খাঁ। গৌরব আলেয়া? ধ্বংস যাদের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে, এক মহাশক্তি যাদের অধীনতার পাথর চাপা দিয়ে অথর্ব পঙ্গু করে রেখেছে, তাদের আবার জাতি—তাদের আবার ধর্ম!

আলেয়া। সে যাই হোক দাদা, তুমি এ বিবাহের সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

ঈশা খাঁ। আলেয়া! ঈশা খাঁ চিরদিন দুর্বার। আজীবন সে রণক্ষেত্রে নরমুণ্ড নিয়ে খেলা করেছে—রূপের সহস্র প্রলোভন চারিদিক থেকে তাকে আকর্ষণ করেছে, সে ফিরেও তাকায়নি; এই ঈশা খাঁ পরাজিত হয়েছে শুধু এইখানে। তুমি দেখ নাই সে রূপ; আমি দেখে বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে চেয়ে রইলুম।

আলেয়া। কিন্তু দাদা! সে যে কুমারী, তা তুমি কি করে জানলে? হয় তো তার স্বামী আছে!

ঈশা খাঁ। স্বামী আছে? না-না কে বললে? এ কথা তো আমি একবারও ভাবিনি! তাই তো, তাই তো বোন, যদি তাই হয়—[ একটু ভাবিয়া ] তা হলে আমি চাঁদ রায়ের পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করবো; তিনি মহান—নিশ্চয় আমায় ক্ষমা করবেন। আর যদি তুমি সুখী হও দিদি, আমি এ প্রস্তাব প্রত্যাহার করি—

আলেয়া। হাঁ দাদা, তাই কর; এমন বিবাহ সুখের হয় না! তুমি তাকে ভালবাসবে, সে তোমায় ঘৃণা করবে, তুমি অনন্ত পিপাসায় তার কাছে ছুটে যাবে, সে তোমার সর্বাঙ্গে বিষের জ্বালা ছড়িয়ে দেবে। আমার দিকপালের মত ভাই, আমি তাকে তার ঘৃণার দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াতে দেবো না।

ঈশা খাঁ। তবে তাই হোক দিদি, আমি এনায়েৎ খাঁকে ফিরিয়ে আনতে লোক পাঠাচ্ছি। দিদি! আমায় ছেড়ে যাস নে। সংসারের দুর্গম পথে এমনি করে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল— [ প্রস্থান।

আলেয়া। এমন ভাই কার? বজ্রের মত কঠোর, আবার কুসুমের মত কোমল! [ প্রস্থানোদ্যোগ ]

কলহরত দিলপিয়ার ও গুলবাহারের প্রবেশ।

দিলপিয়ার। বিচার কর হুজুরাইন!

আলেয়া। কি রে দিলবাহার, আবার তোদের কি হলো?

দিলপিয়ার। আর কও ক্যান হুজুরাইন, আমি হালা এক লম্বরের পোরাকপাইল্যা। কত কইর‍্যা বিয়া কল্লাম, জরুর লেইগ্যা জান-পরাণ খোয়াইলাম—নিজের পেটে ছালি দিয়া বউডারে রাজভোগ খাওয়াইলাম, কিন্তু মন পাইলাম না। মাগী আবার আমারে জবাব দিছে—তোর ঘর করুম না।

আলেয়া। কেন রে বাহার? এই সেদিন ঝগড়া মিটিয়ে নিলি, আবার ও বেচারাকে জ্বালাচ্ছিস?

দিলপিয়ার। কি চান? চুপ কইরা ক্যান? জবাব দাও—

গুলবাহার। তুমি যাই বল দিদি, আমি ও বাঙ্গালের ঘর করবো না; ওর গায়ে বড় গন্ধ।

দিলপিয়ার। হুজুরাইন! আমারে এক বোতল সুগন্ধি ত্যাল দিতে পার? আমি এই মাথাডা ত্যালে চুবাইয়া দেহি, হালার গন্ধ কোহানে থাহে?

গুলবাহার। ওর ঘর করা অবধি একখানা গয়না গায়ে উঠলো না, একখানা ভাল কাপড় পরলুম না—

দিলপিয়ার। ক্যান? তোরে আমি পাছাপাইরা কাপড় দিছি—মাজায় চন্দ্রহার দিছি—পায়ে খারু পরাইছি—

গুলবাহার। তোর মাথা দিয়েছিস বাঙ্গাল ভূত।

দিলপিয়ার। হাহ, খামকা বাঙ্গাল বাঙ্গাল করিছ না—

গুলবাহার। একশোবার বলবো।

দিলপিয়ার। পিছা মারি তোর কপালে—

গুলবাহার। দূর হ ঝাঁটাখেকো!

দিলপিয়ার। দিমু এক কাচির বারি—

আলেয়া। কি হচ্ছে তোদের দিলপিয়ার?

দিলপিয়ার। আরে আমারে বাঙ্গাল বুত কয় দিদি! আমি হই খসম তাই ওর মুয়ে বাত দেই, আর কোন হালা ওর মুয়ে ছালিও দিত না।

গুলবাহার। ওঃ, ভাতের বড়াই করছে। বিয়ে হয়ে অবধি দুবেলা পেট ভরে খেতে পাইনি।

দিলপিয়ার। কি, প্যাট ভইর‍্যা খাইতে পাছ নাই? আমি নিজে কাটা খাইয়া তোরে মাছের মুরা খাওয়াইছি, নিজে ফ্যান খাইয়া তোর বাত জোগাইছি। মিথ্যুক! যা—যা, চইল্যা যা—যেহানে পারছ, গিয়া সুখে থাহ। আমি হালা একলা থাকুম—হেই আমার বাল। দে আমার পাছাপাইরা কাপড় দে—আমার চন্দ্রহার দে—

আলেয়া। শোন দিলপিয়ার! আমি তোমাদের কিছু অর্থ দেবো,

যাতে তোমরা সুখে ঘর-সংসার করতে পারবে। এখন আমার একটা কাজ করে দাও তো! দুজনে ছদ্মবেশে শ্রীপুরে যাবে, চাঁদ রায়ের মেয়ে সোনাকে বলবে—সোনার গাঁর একটা পিপীলিকাকেও যেন বিশ্বাস না করে? খুব সাবধান—খুব সাবধান! কেমন—পারবে?

উভয়ে। খু—ব!

আলেয়া। আচ্ছা, তা হলে এখনি যাত্রা কর! খুব সাবধান!

[ প্রস্থান।

গুলবাহার। এই বাঙ্গাল ভূত!

দিলপিয়ার। আবার বাঙ্গাল বাঙ্গাল করবি?

গুলবাহার। আরে চটিস কেন? ওটা হলো আমার আদরের ডাক।

দিলপিয়ার। হাচাইও!

গুলবাহার। হ্যাঁ রে, তোকে আমি কত ভালবাসি—

**গীত**

গুলবাহার।—ও সোহাগের দিলপিয়ার।
দিলপিয়ার।—দিলডা আমার গইল্যা গেল, ও পিয়ারী গুলবাহার।
গুলবাহার। গোসা আমার জল হয়েছে, করবো রে তোর ঘর,
দিলপিয়ার।—আমি মাথায় কইরা রাখুম তোরে, জানটা করুম আটপ্রহর,
গুলবাহার।—তোর সাথে মোর আর হবে না আড়ি,
দিলপিয়ার।—দিমু তোরে পাছাপাইরা সারি,
গুলবাহার।—আমি গয়না পরে বেগম হব, তুই হবি মোর বিল্লাদার।
দিলপিয়ার —সবার উপর টেক্কা দিমু, বয় করি আর কোন হালার?

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

দেবলের বাটী

তামাক টানিতে টানিতে দেবলের প্রবেশ।

দেবল। ভেবে দেখলুম, সংসারের খাঁটি জিনিস যদি কিছু থাকে তো এই তামাক; এর আগা পাছতলা সব মধু। আর এই ডাবা হুঁকো, আহা ভগবান কি জিনিসই সৃষ্টি করেছেন!

[ সুর করিয়া ]

আমি ডাবা হুঁকো নিয়ে বনবাসী হবো রবো না রবো না ঘরে।
গৃহিণীর জ্বালা সহে না সহে না, সদা মরি ভয়ে ডরে।

[ তামাক সেবন ]

সখি রে! আমার প্রেম যে উঠিছে চলকে,
আমি পটল তুলিলে কারে দিয়ে যাবো আমার এই রাম-কল্কে?
আমি পারিব না হে—
মরণের পর তামাক না পেলে স্বর্গে রহিতে পারিব না হে—
হুঁকোর বিরহ-জ্বালা দুঃসহ, সহিতে আমি পারিব না হে—
হায়, নিয়ে যাব সাথে করে,
কহে জ্ঞানদাস, আমি হুঁকোদাস, হুঁকো নিয়ে আছি মরে।

জগদম্বার প্রবেশ।

জগদম্বা। বলি মিনসে—

দেবল। [ সুরে ] কহে জ্ঞানদাস—

জগদম্বা। শুনছো—

দেবল। [ সুরে ] আমি হুঁকোদাস—

জগদম্বা। তোর হুঁকোর মাথায় ঝাড়ু, আর তোর [illegible]দাসের মুখে ছাই!

দেবল। অমন কথা বলো না গিন্নি! এই ডাবা হুঁকো—যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদীকে নিয়ে বনে গেছলো, তখন আমার ঠাকুরদাদার বাবাকে দিয়ে যায়; আর এই রাম-কল্কে—মহাদেব যখন সতীকে কাঁধে করে নাচছিল, তখন তার ঝুলি থেকে পড়ে যায়।

জগদম্বা। তোমাব মাথা! যুধিষ্ঠির তোমার মত তামাকখোর ছিল কি না!

দেবল। নেই তো নেই। [ তামাক টানিতে লাগিল ]

জগদম্বা। বসে বসে দুবেলা তামাক টানলেই চলবে? আজ কি রান্না হবে, শুনি?

দেবল। রুই মাছের কালিয়া, ডিমের তরকারী, ছানার পায়েস—

জগদম্বা। আরে উনুনমুখো! ঘরে যে চাল নেই—

দেবল। চালিয়ে দাও গে একরকম করে।

জগদম্বা। এক রকমটা কি, তাই শুনি?

দেবল। এই ধার-ধোর করে—

জগদম্বা। ধার করতে কোথায় বাকি রেখেছি? কে দেবে আর?

দেবল। দাদার ওখানে একবার যাও না!

জগদম্বা। আর তুমি বসে বসে তামাক টান! না—আজ আমি কোথাও যাবো না। হতভাগা মিনসে, বিয়ে হয়ে ইস্তক খেতে দিলে না। হাত্তোর সংসারের মুখে আগুন! আমি আজই বাপের বাড়ী চলে যাবো!

দেবল। তবে তাই যাও; চিঠি-পত্র দিও—

জগদম্বা। বটে? আমি বাপের বাড়ী গেলে খুব সুবিধে হয় বুঝি?

দেবল। তবে থাকো।

জগদম্বা। এত কষ্ট সয়ে মানুষ থাকতে পারে?

দেবল। তবে চলে যাও!

জগদম্বা। পোড়ামুখো মিনসে! খেতে পরতেই যদি দিতে পারবে না, তবে বিয়ে করেছিলে কেন? বামুনের ঘরে এমন গরুও তো দুটি নেই।

দেবল। আরে কপালে থাকলে এতেই কাজ হয়।

জগদম্বা। আরে কপাল কি গাছ ফুঁড়ে বেরুবে, না বসে বসে তামাক টানলেই—

দেবল। খবরদার! তামাকের নিন্দে করিসনে—

জগদম্বা। কি? খেতে দিতে পারবিনি, আবার তম্বিরে ড্যাকরা! দাঁড়া তো, পাড়ার লোক জড়ো করছি।

দেবল। দোহাই গিন্নি, আজকের মত—

জগদম্বা। না—আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন!

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। এই, আস্তে গোলমাল কর—

জগদম্বা। তুমি আবার কে?

কেশরী। আমি কেশরীচাঁদ—আসছি রাজবাড়ী থেকে।

দেবল। রাজবাড়ী! কেন—কেন? আমি তো কিছু করিনি—

কেশরী। তোমার নাম দেবল ঠাকুর?

দেবল। আমার নাম? তা—হ্যাঁ—না—না, আমি কেন দেবল হতে যাবো? সে আমার সুমুন্দি।

জগদম্বা। মর পোড়ামুখো মিনসে! নিজের নাম ভাঁড়িয়ে—

দেবল। হাড়োর মেয়ে মানুষের কাঁথায় আগুন—

কেশরী। তাই তো বাবা, এ তো আচ্ছা গেরো! তুমি সিধু ঠাকুরের ছেলে নও?

দেবল। আরে না—না—, তুমি যাও—

জগদম্বা। না গো না, তুমি শোন—

দেবল। মরবে—নির্ঘাত মরবে। তা দেখ কেশরীচাঁদ! তোমার খবর ভাল হয় তো আমার নাম দেবল; আর যদি মন্দ হয়, দেবল আমার শালা!

জগদম্বা। সাধে কি বলি বামুনের ঘরের গরু! বাছা! ওরই নাম ফলনা ঠাকুর।

কেশরী। সঙ আর কি? এই নাও দেওয়ানজীর চিঠি। খপর ভাল, এখনি তোমাকে রাজবাড়ী যেতে হবে।

দেবল। হেঃ-হেঃ-হেঃ! দেখ, রাগ করো না, তামাক খাবে?

কেশরী। তুমিই একটু বেশী করে খাও।

জগদম্বা। [পত্র পড়িয়া] ওরে মিনসে, তোর যে সত্যি সত্যি বরাত খুলে গেল। তুই যে রাজগুরু হবি রে—

দেবল। এ্যাঁ—রাজগুরু! দাদা যে রাজগুরু—

জগদম্বা। তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই দেখ চিঠি—

দেবল। [পত্র পড়িয়া] গিন্নি! নাচো—নাচো—নাচো।

জগদম্বা। নাচবো কেন?

দেবল। একশোবার নাচবে। রাজগুরু—ঠাট্টা কথা নয় বাবা? কত প্রাপ্তি—সোনা-রূপো, কলা-মূলো, গামছা-কাপড়—বাপ রে বাপ রে বাপ! মরে যাবো—মরে যাবো! এখন কি করা যায়—কি করা যায়? ওগো, আমার যে বেজায় হাসি পাচ্ছে—

জগদম্বা। আমার যে আনন্দে কান্না পাচ্ছে গো!

দেবল। ও গিন্নি, হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

জগদম্বা। ও মিন্সে, হায়-হায়-হায়-হায়-হায়!

দেবল। হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ!

জগদম্বা। ওগো আমার কি হলো গো? হায়-হায়-হায়!

দেবল। হিঃ-হিঃ-হিঃ হিঃ-হিঃ!

কেশরী। এই—এই, আস্তে গোলমাল কর। এ ঠাকুর! ঠাকুর—

দেবল। এ্যাঁ?

জগদম্বা। কি বলছো?

কেশরী। আমি কি সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকবো?

দেবল। না-না, তামাক খাও।

জগদম্বা। বসো।

কেশরী। আরে, শীগগির রাজবাড়ী চল।

দেবল। বাবা কেশরীচাঁদ! আমার বদলে গিন্নি যদি যায়?

কেশরী। না-না, তোমাকে যেতে হবে।

দেবল। তবে দাও গিন্নি, হুকোটা দাও—

জগদম্বা। হুকো নিয়ে যাবি কি রে মিনসে? অমনি যা—

দেবল। আচ্ছা, চল— [ কেশরী সহ প্রস্থান।

জগদম্বা। দুগগা—দুগগা! হবে না? বিদ্যেটা কি কম শিখেছে গা! পাড়ার পাঁচ পোড়াকপালীরা—ওদের ভাতার পুতের মাথা খাই, ওরাই শুধু বলে "গরু"। এবার যখন রাজগুরু হয়ে বসবে, হিংসেয় পেট ফেটে মরে যাবে। মর—মর—চুলোমুখীরা, মুখে রক্ত উঠে মর—আমার বুকটা ঠাণ্ডা হোক।

[ প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির-প্রাঙ্গণ

দেবদাসীগণের আরতির পর চম্পকের প্রবেশ

### গীত

চম্পক।—চাঁদবরণ জিনি মুক্তা দশন রে, মেঘবরণ জিনি অঙ্গ।
দেব-গণ।—খঞ্জন-গঞ্জন বঙ্কিম দু'নয়ন, নটবর শ্যাম ত্রিভঙ্গ॥
চম্পক।—অলিদল-গুঞ্জিত নূপুরশিঞ্জিত পদ্মচরণ মনোহারী,
দেব-গণ।—শিরে শিখণ্ডক বনমালা কণ্ঠে, করযুগে মুরলীধারী॥
চম্পক।—কটিতটে পীতবাস, অধরে মধুর হাস, অলকে সিন্ধুতরঙ্গ,
দেব-গণ।—মুগ্ধ ধরণী-জন, ভাবে দেব নিমগন, মূর্ছিত পদে অনঙ্গ॥
চম্পক।—অপরূপ দেহছাঁদ, ভুবনে পেতেছে ফাঁদ, কালাচাঁদ, একি তব রঙ্গ?
দেব-গণ।—রবি শশি তারাদল ঘোরে নিতি অবিরল, লভিতে ও চরণ সঙ্গ॥

[ দেবদাসীগণের প্রস্থান।

চাঁদ রায়ের প্রবেশ।

চাঁদ। চম্পক!

চম্পক। কেন মহারাজ?

চাঁদ। ওই নামের মহিমায় আমাকে ডুবিয়ে দিতে পারিস? এ বুকে বড় জ্বালা রে, বড় জ্বালা! বাইরে এমন বৃষ্টিপাত হচ্ছে—মন্দিরের মধ্যে এমন নামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, তবুও বুকের আগুন নেভে না কেন?

চম্পক। কোথায় ব্যথা তোমার মহারাজ?

চাঁদ। কোথায় ব্যথা? চারিদিকে ব্যথা; দেহে-মনে, সুখে-সমৃদ্ধিতে, জয়ে-পরাজয়ে, জাগরণে-নিদ্রায়। যা দেখি—সব কুৎসিৎ,

যা কিছু ভাবি—সব আবছায়া। [ চুপি চুপি ] হাঁ রে চম্পক, তোর দিদি কোথায় রে ?

চম্পক। ওই যে মন্দিরের মধ্যে ; দেখবে ?

চাঁদ। না-না, পালাই চল! আমার দুঃখিনী মা ধ্যান ভেঙ্গে শিউরে উঠবে। আয়—পালাই চ', সে একটু ভুলে থাক!

চম্পক। জ্যাঠামশাই! তুমি কাঁদছো ? বড় ব্যথা পেয়েছ, না ? এসো, আমি তোমার বুকে হাত বুলিয়ে দিই·

চাঁদ। আঃ—এত শান্তি তোর স্পর্শে! ভগবান! আমায় তবে নিঃস্ব করনি ; এই দুঃখের মহাশ্মশানেও ফুটিয়ে রেখেছ এই একটী সুগন্ধি গোলাপ। চম্পক! একখানা গান গাও তো বাবা, এমন গান—যা শুনলে শত দুঃখ জল হয়ে যায়।

চম্পক। তবে শোন ; এই গানটা আমার গুরুদেব শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

### গীত

নিঠুর হে, আমার এ হৃদয়মাঝে—
তোমারি দেওয়া বাজেরি আঘাত বাঁশরীর সুরে বাজে।
কণ্টক মোর কণ্ঠের হার, তোমারি সে প্রিয় স্নেহ উপহার,
বেদনার মাঝে ওগো প্রিয়তম, তোমারি চরণ রাজে।
ধূপের মতন আমারে পোড়াও, দীপের মতন আমারে জ্বালাও,
বিস্ময়ে সারা ধরণী ভরিবে ( আমার ) চোখের জলের তাজে।

[ প্রস্থান।

চাঁদ। কোটীশ্বর! দুঃখ দিয়েছ যদি, সইবার শক্তি দাও!

কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। মহারাজ! ঈশা খাঁর দূত এনায়েত খাঁ—

চাঁদ। কই—কোথায়? যাও, তাঁকে এইখানে নিয়ে এসো—

কেদার রায় ও এনায়েতের প্রবেশ।

কেদার। এসো বন্ধু—এসো; সোনারগাঁর কুশল তো? বীরবর ঈশা খাঁ কুশলে আছেন? সহসা কি প্রয়োজনে এসেছ এনায়েত?

এনায়েত। একটা আনন্দ-সংবাদ নিয়ে এসেছি বীর! ঈশা খাঁর সঙ্গে রায়বংশের স্নেহের সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ আরও দৃঢ় করবার জন্য ঈশা খাঁ একটী প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন। এই নিন মহারাজ তাঁর পত্র—

চাঁদ। দেখ তো কাঞ্চন, কি লিখেছে?

কাঞ্চন। [ পত্র পড়িয়া ] ওঃ—মহারাজ! [ কম্পিত হস্ত হইতে পত্র পড়িয়া গেল ]

চাঁদ ও কেদার। কি কাঞ্চন?

কেদার। [ পত্র কুড়াইয়া পড়িলেন ও ক্রোধে দূরে নিক্ষেপ করিলেন ]

চাঁদ। কি লিখেছে, দেখি—

কেদার। না দাদা, ও তুমি স্পর্শ করো না, ও পত্র অস্পৃশ্য। ওতে এমন তীব্র বিষ আছে যে, তার স্পর্শে তোমার রোমে রোমে জ্বালার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটবে।

চাঁদ। ছিঃ কেদার! [ পত্র কুড়াইয়া পড়িলেন, পরে হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন ] ঈশা খাঁ!

কাঞ্চন। বন্ধু—বন্ধু—বন্ধু! [ পত্রখানা শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিল ] এমন বন্ধু কে কবে পেয়েছে?

এনায়েত। [ সক্রোধে ] কুমার!

কেদার। কথা কয়ো না, এখনো তুমি মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ, এই যথেষ্ট!

এনায়েত। কেন?

চাঁদ। কেন? জগৎ জানে, চাঁদ রায় নিষ্ঠাবান হিন্দু, তার মন্দির-প্রাঙ্গণে বিধর্মী তুমি, নিঃসঙ্কোচে প্রবেশের অধিকার পেয়েছ। এতখানি তোমাদের বিশ্বাস করতুম। জাতির বৈষম্য ভাবিনি, ধর্মের প্রভেদ গ্রাহ্য করিনি, শুধু বীর বলে এই ঈশা খাঁকে আলিঙ্গন করেছি, নিজের মন্ত্রণাকক্ষে সাদরে আহ্বান করেছি; তার এই প্রতিদান? চাঁদ রায়ের কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব? বিশ্বাসঘাতক!

এনায়েত। খবরদার রাজা!

কাঞ্চন। কথা বলতে লজ্জা হচ্ছে না? একটা ঘৃণ্য প্রস্তাব বয়ে এনেছ চাঁদ রায়ের কাছে?

কেদার। তোমাকে আর কি বলবো এনায়েত! এ প্রস্তাব যদি ঈশা খাঁ নিয়ে আসতো; তা হলে তার জিহ্বাটা এতক্ষণ উপড়ে ফেলতুম।

এনায়েত। আমাকেই বা দয়া করছো কেন?

কেদার। দয়া? দয়া আমার নেই; যা ছিল, এইমাত্র তুমি তা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছ। ভালই করেছ। বিশ্বাস আর কাউকে করবো না—কাউকে না! সংসার এত হীন যে, দয়া করলে মনে করে দুর্বলতা, ক্ষমা করলে ভাবে কাপুরুষতা।

এনায়েত। রাজা! তা হলে আপনি এ প্রস্তাবে অসম্মত?

চাঁদ। আবার জিজ্ঞাসা করছো?

কেদার। হীনবুদ্ধি ঈশা খাঁর এ ঘৃণিত প্রস্তাবে আমরা সহস্রবার পদাঘাত করি।

এনায়েত। সাবধান কেদার রায়!

কেদার। সাবধান হও তুমি এনায়েৎ খাঁ! তোমায় যে কি করবো আমি এখনও ভেবে ঠিক করতে পারছি না। তুমি যদি শুধু দূত হতে,

আমরা তোমায় ক্ষমা করতে পারতুম; কিন্তু তুমি ঈশা খাঁর বন্ধু—তার মন্ত্রী। তোমায় আকণ্ঠ প্রোথিত করে গোখরো সাপ দিয়ে দংশন করালেও আমার গায়ের জ্বালা মিটবে না।

এনায়েত। রাজা ঈশা খাঁর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ হলে—

[ একসঙ্গে চাঁদ, কেদার ও কাঞ্চন তরবারিতে হাত দিলেন। ]

কেশার মার প্রবেশ।

কেশার মা। কি বললি? ঈশা খাঁর সঙ্গে সোনার বে?

ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। প্রস্তাবটা কে এনেছে?

কাঞ্চন। ঈশা খাঁর বন্ধু।

কেশার মা। [ এনায়েতের সম্মুখে গিয়া ] তুই? ও—মরবার পালক উঠেছে বুঝি? তাই পোড়ামুখো সেদিন হাঁ করে সোনার দিকে চেয়েছিলো। চাঁদ! কি ভাবছো? হ্যাঁ কেদার! তুমিও হাত গুটিয়ে বসে আছ? ও দাদা, তুই-ই বা কি করছিস? মিনসের কাঁধে এখনও মাথাটা রয়েছে যে রে!

কাঞ্চন। বড্ড ছোট মাথা, মজুরী পোষাবে না।

ভবানী। [ চাঁদের প্রতি ] কি ভাবছো?

চাঁদ। ভাবছি—বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি কত ভীষণ হতে পারে!

ভবানী। [ কেদারের প্রতি ] তুমি কি ভাবছো?

কেদার। আমি ভাবছি, এই একটা মাথা নিয়ে প্রাণের জ্বালা কতটুকু মিটবে? ঈশা খাঁর বংশ নির্মূল করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেও এ অপমানের শোধ হবে না।

ভবানী। আর তুমি কাঞ্চন?

কাঞ্চন। আমি ভাবছি মা, কতক্ষণে ঈশা খাঁর কলাগাছিয়া দুর্গ ছাই করে সেই ছাই মুঠো-মুঠো করে ঈশা খাঁর মুখে ছড়িয়ে দিয়ে আসবো। কত দিনে তার তপ্ত রক্ত গায়ে মেখে মহোল্লাসে নৃত্য করবো! কবে সে শয়তান বুঝবে যে, চাঁদ রায়ের বংশের অপমান করলে মৃত্যু দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

ভবানী। সাবাস পুত্র! এনায়েত খাঁ! আর তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নেই। যাও—চলে যাও, আর কখনো শ্রীপুরের পথে পা বাড়িয়ো না।

চাঁদ। বল গিয়ে তোমার প্রভুকে তার প্রস্তাবের উত্তর চাঁদ রায় রণক্ষেত্রে দেবে।

এনায়েত। রাজা—

ভবানী। চুপ, একটা কথাও নয়, নিঃশব্দে চলে যাও। বাঙ্গালী মায়ের প্রাণ বড় কোমল, তাই তুমি মাথা নিয়ে ফিরে যাচ্ছো।

এনায়েত। বুঝে দেখ চাঁদ রায়! যদি নিজের মঙ্গল চাও, ঈশা খাঁর সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহ দাও—

[ কাঞ্চন, চাঁদ ও কেদারের তরবারি একসঙ্গে নিষ্কাসিত হইল ]

ভবানী। থাক, ক্ষান্ত হও। মা! ওকে বের করে দাও।

কেশার মা। চলে আয়। তবু দাঁড়িয়ে? আয় বলছি, নইলে তোর মাথাটা আমিই ছিঁড়ে ফেলবো।

এনায়েত। বেশ, তা হলে আমি ফিরে যাচ্ছি রাজা! কিন্তু মনে রেখো, যে ভুল আজ তুমি করলে, সারাজীবন অনুতাপের অশ্রুজলে সাগর বইয়ে দিলেও সে ভুলের সংশোধন হবে না। ঈশা খাঁ কি করবেন, জানি না; কিন্তু শোন রাজা! বর্তমানে আমি মুসলমান হলেও

আমার বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে একটা রাজপুত, সে নিয়তির মত দুর্বার—মৃত্যুর মত করাল—বজ্রের চেয়ে কঠোর।

[ প্রস্থান।

কেশার মা। বন্ধু! মুখে আগুন অমন বন্ধুর—

[ প্রস্থান।

ভবানী। রাজা! ঈশা খাঁ জানে যে, স্বর্ণময়ী বিবাহিতা—বিধবা?

কাঞ্চন। জানে না? নিশ্চয়ই জানে। কতবার সে শ্রীপুরে এসেছে, আর এই খবরটা জানে না?

চাঁদ। আমি আশ্চর্য হচ্ছি তার স্পর্ধা দেখে। সে কি উন্মাদ? চাঁদ রায়কে সে চেনে না? চাঁদ রায় মরবে, তবু তার বংশে এতটুকু কলঙ্ক লেপন করবে না।

গীতকণ্ঠে সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন।—

### গীত

শিরে তব পুষ্পবৃষ্টি হোক।
জয়-গানে তব চির নিশিদিন ভরে যাক তিন লোক॥
মহিমা তোমার সবার স্মরণে, দেখাবে আলোক সাত কোটি জনে,
বাণী তব প্রিয় দেব-বাণী সম হয়ে যাবে একযোগ॥
এমনি বহিও আমার নিশান, বরপুত্র তুমি, তুমি গরীয়ান,
আসুক ঝঞ্ঝা কালবৈশাখী, আসুক দুঃখ শোক॥

[ প্রস্থান।

ভবানী। এখন কি করবে?

চাঁদ। যুদ্ধ।

কেদার। ধ্বংস।

কাঞ্চন। প্রতিশোধ।

ভবানী। কিন্তু—

চাঁদ। কিন্তু? এর মধ্যে "কিন্তু" নেই রাণী। ঈশা খাঁ মরবে। সে জানে না, চাঁদ রায় দুঃখদীর্ণ হলেও চাঁদ রায়, তার একটা আহ্বানে শত সহস্র বাঙ্গালীর লাঠি মরণোৎসবে মেতে উঠবে, রাজার প্রাসাদ হতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্যন্ত সবার গৃহে বিজয়ের দুন্দুভি বেজে উঠবে। কেদার! সৈন্য সাজাও, মাত্র সাত দিন সময় দিলুম; তারপর সন্দীপের দুর্গ ধ্বংস করতে আমরা অভিযান করবো।

কাঞ্চন। আমি কিন্তু সাত দিন অপেক্ষা করতে পারবো না রাজা! আজ এখনি আমি কলাগাছিয়া দুর্গ ধ্বংস করতে ছুটবো।

কেদার। সৈন্য?

কাঞ্চন। পাই ভাল, না পাই, চাই না। রাজপথ দিয়ে যাবার সময় বলতে বলতে যাবো—"ঈশা খাঁ তোমাদের আদরের দুলালী সোনার বৈধব্যকে অপমান করেছে; কে আছ বাঙ্গালী, প্রতিশোধ নেবে এসো! তাতে যে আসে আসবে, না আসে, একা আমি যমের সঙ্গে খেলবো! ভয় কি বাবা? সিংহশাবক শিশু হলেও দুর্বল নয়।

কেদার। আবার বল—সিংহশাবক শিশু হলেও দুর্বল নয়! কলাগাছিয়া দুর্গ ধ্বংস করে, অথবা মানের জন্য শির দিয়ে প্রমাণ করা চাই—সিংহশাবক শিশু হলেও দুর্বল নয়। এই নাও পুত্র, আমার আশীর্বাদের সঙ্গে লক্ষ সৈন্য। [ নিজের তরবারি প্রদান ]

ভবানী। কলাগাছিয়া দুর্গ ধ্বংস করতে এই বালককে পাঠাবে? তাও সঙ্গে সৈন্য নেই—

কাঞ্চন। কে বলে সৈন্য নেই? এই যে আমার লক্ষ সৈন্য।

[ তরবারি দেখাইল ] আজ আমার চেয়ে শক্তিমান কে ? জয় কোটীশ্বর—জয় কোটীশ্বর ! [ আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে প্রস্থানোদ্যোগ ]

চাঁদ। কাঞ্চন ! কাঞ্চন ! [ কাঞ্চন বন্য হরিণের মত একলাফে ফিরিয়া আসিয়া মুহূর্তে সকলের পদধূলি লইয়াই নিমেষে প্রস্থান করিল। ] ফেরাও—ফেরাও কেদার ! এখনও তো আমরা মরিনি ! আমরা থাকতে এই বালক যাবে দুর্গ জয় করতে ?

কেদার। শুনলে তো দাদা, "সিংহশাবক শিশু হলেও দুর্বল নয় !"

ভবানী। কিন্তু এর পরিণাম কি, ভেবেছ নিষ্ঠুর ?

কেদার। হয় জয়, না হয় মৃত্যু।

[ প্রস্থান।

ভবানী। যেমন বাপ, তেমনি ছেলে ; যুদ্ধের নামেই নেচে ওঠে।

[ প্রস্থান।

চাঁদ। তবে ত্রিবেণীর দুর্গটাই বা থাকে কেন ? কার্ভালোকে পাঠাই ত্রিবেণী ধ্বংস করতে। কোটীশ্বর ! বাঁশী ছেড়ে অসি ধর, বনমালা ফেলে দিয়ে নরমুণ্ডমালা পরবে এসো। ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস !

[ প্রস্থান।

———

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

পথ

কেশরী ও গীতকণ্ঠে লাঠিয়ালগণের প্রবেশ।

লাঠিয়ালগণ।—

গীত

চল রে, চল রে, চল,
চুমুকে শুষিয়া সিন্ধুনীর, রক্ত তুলিব বঙ্গবীর,
নিঃশ্বাসে মোরা নিভায়ে দিব রে সিন্ধু বাড়বানল।
ওরে ও বঙ্গবীর, বঙ্গসাগরতীর
ধ্বনিয়া উঠিবে আমাদের নামে, নমিবে লক্ষ শির,
মৃত্যুর বুকে হানিব বাজ, পরিব মাথায় বিজয় তাজ,
আনিব জয় আনিব আজ, নহে যাবো রসাতল॥

কেশরী। চল—চল, ছুটে চল, কলাগাছিয়া দুর্গ ধ্বংস করা চাই।

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। হ্যাঁ হে মুরুব্বি, শ্রীপুরের রাজবাড়ীটা কোন দিকে বলতে পার?

কেশরী। কোথা থেকে আসছো?

বান্দা। সোনার গাঁ থেকে।

কেশরী। তুমি কে?

বান্দা। ঈশা খাঁর চর।

কেশরী। ঈশা খাঁর চর? সেই ঈশা খাঁ, যে আমাদের রাজ-কুমারীকে অপমান করেছে?

সকলে। মার—মার! [ লাঠি বাগাইল ]

বান্দা। এ কি? তোমরা আমাকে—

সকলে। মার—মার!

বান্দা। দাঁড়াও—আমায় বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের কোন অনিষ্ট করতে আসিনি। প্রাসাদের পথটা একবার দেখিয়ে দাও, বড় জরুরি খবর।

কেশরী। জরুরি খবর? সে বুঝতেই পারছি। খবরদার! রাজবাড়ীর দিকে পা বাড়াস নে—খুন করবো।

বান্দা। কেন বাধা দিচ্ছ হিন্দু? আমি কোন কুমতলবে আসিনি। জাঁহাপনার হুকুম, চাঁদ রায়ের সঙ্গে আমায় দেখা করতেই হবে। ছেড়ে দাও—পথ ছেড়ে দাও, আমি আজ তিন দিন না খেয়ে ছুটে আসছি, আমায় যেতে দাও—

লাঠিয়ালগণ। খুন করবো—

কেশরী। ফিরে যা বলছি। যা করেছিস তোরা, তাতেই আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, আবার খবর! যা বলছি! আর একটু এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে লাঠির ঘায়ে তোর মাথাটা গুঁড়িয়ে দেবো।

বান্দা। তবু জাঁহাপনার হুকুম আমায় তামিল করতেই হবে।

[ প্রস্থান।

কেশরী। দাঁড়া, আমি ওর মাথাটা ভেঙ্গে দিয়ে আসছি—

[ প্রস্থান।

১ম লাঠিয়াল। এই চল, কুমার এগিয়ে গেছে, আর দেরী করা চলবে না। জয় কোটীশ্বর—জয় কোটীশ্বর। [ লাঠিয়ালগণের প্রস্থানোদ্যোগ ]

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। টাকা চাই—খাবার চাই—ওষুধ চাই! এ কি অত্যাচার! শ্রীপুর আজ শ্রীমন্তকে একঘরে করেছে; দোকানদার জিনিস বেচতে চায় না, বৈদ্য ওষুধ দিতে চায় না—শ্রীপুরের দোরে দোরে মাথা খুঁড়ে মরলেও একটা পয়সা কেউ ভিক্ষা দেয় না। এই যে, এরা কারা? ওহে, আমায় একটা টাকা দিতে পার?

লাঠিয়ালগণ। টাকা—

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ, টাকা—রূপোর চাকতি, একদিন যা আমি দুপায়ে মাড়িয়েছি। দাও—আমার বড় অভাব। টাকা না দাও, শুধু দুটি পয়সা দাও। আমার ছেলে না খেতে পেয়ে রোগে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে যাচ্ছে! বৈদ্যদের দোরে দোরে ঘুরলুম, কেউ এক ফোঁটা ওষুধ দিলে না, আজ তিন দিন তার পেটে দানাটি পড়েনি। দাও, দুটি পয়সা দাও—

১ম লাঠিয়াল। তুমি না আমাদের রাজকুমারীর জীবনটা মাটি করেছ? পয়সা দেবো তোমাকে? ফুঃ—

[ শ্রীমন্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। দিলে না—সবাই উপহাস করছে; অথচ একদিন আমায় দেখলে এরা পায়ের ধুলো নেবার জন্য কাড়াকাড়ি করতো। কি করি? কোথায় যাই? কেমন করে ছেলেটাকে বাঁচাই? কোটীশ্বর! তোমার পায়ে আমার দেওয়া পুষ্পাঞ্জলি এখনও বোধ হয় শুকিয়ে যায়নি!

দয়া কর—দয়া কর—আমার মা-হারা সন্তানটিকে বাঁচতে দাও! কেউ শোনে না, দেবতারাও আজ বধির! হে ভগবান! তোমার দেওয়া ফল-শস্য বুঝি আমার হতভাগা ছেলের জন্য নয়! [ শ্রান্তভাবে উপবেশন ]

গীতকণ্ঠে জনৈক চাষীর প্রবেশ।

চাষা।—

গান

আমার মনটা গেছে চুরি—
ঘুমিয়েছিলাম নিঝুম রাতে, চাঁদের আলোয় নিরালাতে,
সকালবেলা জাগিয়ে দিলে বেলোয়াড়ি চুড়ি গো।
কথায় কথায় কখন পিয়া, পালিয়ে গেল প্রাণটা নিয়া,
খুজে খুঁজে পাইনে দিশে ( আমি ) হাওয়ার সাথে উড়ি গো।
জানি না সে কোথায় আছে, দূরে না কি কাছে কাছে,
হা রে আমায় করলে পাগল নোলকপরা ছুঁড়ি গো।
দিনের বেলা তবু হাসি, রাতে চোখের জলে ভাসি,
মুখ দেখে মোর কেঁদে মরে রামগোপালের খুড়ী গো।

[ প্রস্থানোদ্যত।

শ্রীমন্ত। [ উঠিয়া ] ওহে—ওহে! আমায় একটা পয়সা দিতে পার?

চাষা। [ বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া ] ঠাকুর না?

শ্রীমন্ত। ভিখারী—ভিখারী! একটা পয়সা দাও তো—

চাষা। উহুঁ! তোমাকে ঠাকুর একটা কাণাকড়িও কেউ দেবে না।

[ সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। একটা চাষা, সেও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। বুঝেছি, শ্রীপুরে বাস করা আর চলবে না। কিন্তু ঘরে বাস্তুদেবতা;

দূর হোক বাস্তুদেবতা, কালীগঙ্গার জলে ফেলে দেবো। দেবতা নেই! কিন্তু রোগা ছেলেটাকে নিয়ে কোথায় যাবো? ভগবান! আহার্য দেবে না যদি, বাপের প্রাণটা এমন মায়ায় জড়িয়ে দিয়েছ কেন?

মস্তকে নানা দ্রব্যসম্ভার লইয়া তামাক টানিতে
টানিতে দেবলের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। দেবল? কি আছে ওতে ভাই? বাঃ-বাঃ-বাঃ, এ যে অনেক খাবার! আমায় দিবি?

দেবল। দেবো তো, কিন্তু—

শ্রীমন্ত। দেবল! বরাতের গুণে তুমি আজ আমার আসনে বসেছ, আর আমি আজ এই শ্রীপুরে পথের ধুলোর চেয়েও অধম। তুমি রাজরাজেশ্বর হও—তুমি দীর্ঘজীবী হও। এমন দান তুমি অনেক পাবে দেবল! শুধু এই একদিনের উপার্জন আমায় দাও। আমার ঘরে আজ তিন দিন কিছু নেই, ছেলেটা না খেয়ে—

দেবল। এ্যাঁ, তাই নাকি? আগে বলতে হয়। আচ্ছা, তুমি নিয়ে যাও। কিন্তু দেখো দাদা! আমি তোমায় দিয়েছি, এ কথা যেন কেউ না জানে; তাহলে আমাকেও—বুঝেছ? আচ্ছা আমি চললুম, কেউ আবার হয় তো দেখতে পাবে—[ প্রস্থানোদ্যত ]

শ্রীমন্ত। দেবল। না, আমি তোমার দান নেবো না। আমি হাজার হলেও ভাই, নিজের জন্য তোমায় বিপন্ন করবো না। কি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? নিয়ে যাও—এখনি নিয়ে যাও; এ প্রলোভনের ডালি আমার সামনে আর রাখতে পাবে না! নেবে না? তা হলে আমি সব রাস্তায় ছড়িয়ে দেবো—

[ ভয়ে ভয়ে পুটলি লইয়া দেবলের প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। চুরি করবো—ডাকাতি করবো, যা হয় হবে। কিসের ধর্ম? আমার ছেলে না খেয়ে শুকিয়ে মরবে, আর পণ্যশালায় থরে থরে খাদ্য সাজানো থাকবে? একটা পয়সার অভাবে আমার রোগা ছেলের পথ্য জুটবে না, আর বড় মানুষেরা টাকার গদিতে শুয়ে থাকবে? না—সইবো না, লুট করবো। লুট—লুট। বোম ভোলা। [ প্রস্থানোদ্যত ]

রণসাজে সজ্জিত চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। কে—চাঁদ? যুদ্ধে চলেছ? দাঁড়াও, যাবার আগে আমার একটা কথা আছে।

কেদার। শোনবার সময় নেই।

শ্রীমন্ত। তা হলেও শুনতে হবে। চাঁদ! এ কি অত্যাচার? শ্রীপুরে আমি একঘরে? [ দুঃখে, ক্রোধে কণ্ঠ বিকৃত হইল ] এ তোমার হুকুম?

কেদার। না, আমার। তুমি সমাজের দোহাই দিয়ে স্বর্ণময়ীর জীবনটা ব্যর্থ করেছ, তাই সমাজ তোমায় ত্যাগ করেছে। অভাবে, দুঃখে, জ্বালায় দগ্ধ হয়ে তুমি মর্মে মর্মে অনুভব কর, সন্তানের মলিন মুখ পিতার বক্ষে কতখানি বাজে, সন্তানের সুখের কাছে সমাজের শাসন কি তুচ্ছ!

শ্রীমন্ত। আমি বুঝবো না। আমি শ্রীপুরের প্রজা, আমার এ দাবী। ভগবানের দেওয়া ফল-শস্য, ভগবানের দেওয়া সুখ-শান্তি তোমরা যদি দু'হাতে ভোগ করতে পার, আমি কেন উপবাসী রয়ে যাবো? তোমাদের ছেলে-মেয়েরা যদি পেট ভরে খেতে পায়, আমার ছেলে-মেয়ে কেন না খেয়ে শুকিয়ে মরবে? কেন—কেন?

কেদার। তোমার দোষে।

চাঁদ। ঠাকুর। আপনার পুত্র উপবাসী ?

শ্রীমন্ত। মুমূর্ষ। [ কণ্ঠ অশ্রুবিকৃত হইল ] টাকা দাও—খাদ্য দাও, নইলে আমি যেতে দেবো না। দাও—দাও রাজা।

কেদার। দেবো—ভাণ্ডার খুলে খাদ্য দেবো—তোমার পর্ণকুটীর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবো ঠাকুর। একটা কথা শুধু বল, বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দিতে পারবে ?

শ্রীমন্ত। আমি পারবো না।

কেদার। তবে ঐ কালীগঙ্গার জল আছে, তোমার পুত্রের জন্য নিয়ে যাও। আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করলেও এই শ্রীপুরে কেউ তোমায় এক কণা খাদ্য দেবে না।

চাঁদ। অত নিষ্ঠুর হোসনে কেদার। একদিন যাঁর হাতে রাজত্ব তুলে দিলেও যিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেই ব্রাহ্মণ আজ প্রার্থী—গৃহে তার পুত্র-কন্যা উপবাসী। এখানে অভিমান সাজে না কেদার! ভুলে যা—ভুলে যা সে অতীতের কথা। আমাদের ঘরেও পুত্র-কন্যা আছে; তারা যদি এমনি করে উপবাসে আর্তনাদ করতো, না—না, এ ভাবা যায় না। ঠাকুর—

কেদার। দাদা—

চাঁদ। না কেদার। শুভযাত্রার পূর্বক্ষণে এমন নিষ্ঠুরতা করিসনে ভাই। আসুন ব্রাহ্মণ, আমি আদেশ দিচ্ছি—

জনৈক কৃষাণের প্রবেশ।

কৃষাণ। বাবাঠাকুর। বাবাঠাকুর! খোকা নেই—

শ্রীমন্ত। নেই—নেই ? সব শেষ ? নিষ্ঠুর! পালিয়ে গেলি ? এত

দিন পাখীর মত পালকঢাকা দিয়ে রেখেছিলুম, না বলে পালিয়ে গেলি? যাবে না? খেতে দিতে পারিনি! রাজার ঐশ্বর্য যে দু'পায়ে মাড়িয়ে গেছে, তার ছেলে আজ না খেয়ে মরে! কোটীশ্বর!—[ ক্রোধে সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল ]

[ চাঁদ রায়ের ইঙ্গিতে কৃষাণের প্রস্থান।

চাঁদ। ব্রাহ্মণ!—

শ্রীমন্ত। কি বলছো? বলবে তো এই যে, সংসারের এমনি নিয়ম; যম যখন টানে, মানুষ রাখতে পারে না। মানি; কিন্তু এমন করে কার ছেলে মরে? যে দেশে মাঠভরা ধান, পুকুরভরা জল, ঘরে ঘরে লক্ষ্মী সোনা ঢেলে দিয়েছে, সে দেশে একটা শিশু—বামুনের ছেলে এমনি করে মাটি কামড়ে মরে কেন?

কেদার। পিতার অপরাধে।

চাঁদ। ঠাকুর! যুদ্ধ হতে ফিরে এসে দু' ভায়ে অশ্রুজলে তোমার চরণ ধুয়ে দেবো। আপাততঃ আমি আদেশ দিয়ে যাচ্ছি, তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য—

শ্রীমন্ত। চুপ—চুপ! আমার গ্রাসাচ্ছাদন? একথা শুনলে পরলোকে সে আমার ডুকরে কেঁদে উঠবে। আমি খাবো? আমি খাবো? মুমূর্ষু ছেলের মুখে এক ফোঁটা দুধ দিতে পারিনি, ওঃ—রাজা! কাটা ঘায়ে প্রলেপ দিতে এসেছ? না—অনেক সয়েছি, আর সইবো না। যে সয়, তারই বুকে বাজের ঘা পড়ে—তাকেই দেখে সংসারটা ঘৃণায় সরে যায়—তারই ছেলের বুকে যম এসে হাঁটু দিয়ে বসে। আমি সইবো না! আমি যা হারিয়েছি, তোমাদের তা ভোগ করতে দেবো না। আমার এই উপবীতটা আমি কালীগঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে যাচ্ছি; যেদিন তোমাদের বুকে এমনি হাহাকারের আগুন জ্বালিয়ে

দিতে পারবো, সেদিন আবার ব্রাহ্মণ হবো, নইলে এই শেষ—এই শেষ—

[ প্রস্থান।

চাঁদ। কেদার! কি করলে তুমি কেদার?

কেদার। কিছুই করিনি দাদা! এ প্রকৃতির প্রতিশোধ। শ্রীমন্তের পুত্র অনাহারে মরেনি, মরেছে সোনার দীর্ঘনিঃশ্বাসে।

চাঁদ। কিন্তু এ ব্রাহ্মণ নীরবে এই শোক সইবে না; হয়তো এমন দংশন করবে যে, আমাদের অন্তরাত্মা যন্ত্রণায় ত্রাহিরবে আর্তনাদ করে উঠবে।

কেদার। চাঁদ রায় কেদার রায় সর্পদংশন মাথা পেতে নিতে পারে, মানুষের দংশনকে তারা ভয় করে না। চল দাদা। জয় কোটীশ্বর—

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

সোনারগাঁ প্রাসাদ—ঈশা খাঁর কক্ষ

আলেয়া।

আলেয়া। কেন এই এনায়েত খাঁকে দেখলে আমার মনটা তোলপাড় করে ওঠে? সে বীর, কিন্তু নিষ্ঠুর; সে সুন্দর, কিন্তু তার অন্তরটা কুষ্ঠরোগীর মত কুৎসিত। তবে কেন এমন হয়? এনায়েত আমার কে? না—না, আমার স্বামীকে আমি না পাই, সারাজীবন তাঁর জন্য তপস্যা করবো, তবুও অন্যের রূপ মনের মধ্যে লুকিয়ে

রেখে তাঁর কাছে অবিশ্বাসিনী হবো না। আমি এনায়েতকে ঘৃণা করি—হ্যাঁ, আমি এনায়েতকে ঘৃণা করি।

এনায়েতের প্রবেশ।

এনায়েত। কেন?

আলেয়া। কে—তুমি? কোথা থেকে এলে?

এনায়েত। শ্রীপুর থেকে।

আলেয়া। ওঃ—তা দাদা তো এখানে নেই! তুমি শ্রীপুর পর্যন্ত গিয়েছিলে? বান্দার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?

এনায়েত। কই—না।

আলেয়া। তারপর, শ্রীপুর গিয়ে কি করলে?

এনায়েত। ঈশা খাঁর পত্র চাঁদ রায়কে দিলুম।

আলেয়া। আর দেখতে দেখতে চাঁদ রায়ের মুখখানা আষাঢ়ের মত মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো, কেদার রায়ের চোখ দু'টোতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটলো, আর কেদার রায়ের পুত্র কাঞ্চন বাঘের মত লাফিয়ে উঠলো—কেমন? তারপর কি হলো?

এনায়েত। তারা আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিলে।

আলেয়া। বেশ করেছে; চাঁদ রায় দয়ালু, তাই তোমাকে শুধু অপমান করেই ফিরিয়ে দিয়েছে, কেদার রায় রাজা হলে তোমার মাথাটা ছিঁড়ে কালীগঙ্গার জলে ফেলে দিত।

এনায়েত। [ হাসিয়া ] কেদার রায়?

আলেয়া। হ্যাঁ, কেদার রায়। হাসলে যে এনায়েত খাঁ? পেয়েছ তাঁর শক্তির পরিচয়? তাঁকে রণক্ষেত্রে কখনও দেখেছ? আমি এক-দিন প্রাসাদের চূড়া থেকে তাঁর যুদ্ধ দেখেছি। বাঙালী যে এমন

বীর হতে পারে, কেদার রায়কে না দেখলে আমি বুঝতে পারতুম না। যাক, এখন কি করবে?

এনায়েত। এ অপমানের প্রতিশোধ নেবো।

আলেয়া। অপমান যে তুমি কুড়িয়ে আনতেই গিয়েছিলে এনায়েত খাঁ। তুমি কি আশা করেছিলে, এই পত্র পেয়ে চাঁদ রায় তোমায় সোনার পালঙ্কে বসিয়ে রাজভোগ খাওয়াবে?

এনায়েত। আমি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি যে, এ প্রস্তাব চাঁদ রায় এমনি করে প্রত্যাখ্যান করবে।

আলেয়া। আমি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি এনায়েত খাঁ যে তুমি সত্যিই মাথা নিয়ে ফিরে আসবে। তারা বোধ হয় তোমায় দুর্বল বলে ক্ষমা করেছে। এখন আমি বলি এনায়েত খাঁ—

এনায়েত। থাক, তুমি অনেক বলেছ শাহজাদি! এবার আমি একটা কথা বলছি শোন। যেখানে একটা রাজ্যের উত্থান-পতন নির্ভর করছে, সে সব বিষয়ে নারীর সঙ্গে একটা কথা বলতেও এনায়েত খাঁ ঘৃণা বোধ করে। গুরুতর রাজকার্যে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন ঈশা খাঁ, এনায়েত নয়। তুমি ঈশা খাঁর কাছে পীর পয়গম্বর হতে পার, কিন্তু আমার কাছে তুচ্ছ একটা নারী মাত্র।

আলেয়া। নারী চেন এনায়েত খাঁ?

এনায়েত। চিনি না? নারী অসার—অপদার্থ—সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখবার যন্ত্র মাত্র!

আলেয়া। কি?

এনায়েত। জগতের যত বিষ নারীই উগরে দিয়েছে। চিরদিন দেখে এলুম, পুরুষ যজ্ঞ করতে নেমেছে, নারী করেছে পণ্ড; পুরুষ বেহেস্তের পথে চলেছে, নারী তাকে দোজাকের পথে টেনে এনেছে

পুরুষের মাথা থেকে বিজয়-মুকুট কেড়ে নিয়ে এই নারী পরাজয়ের পুরীষ-কর্দম ঢেলে দিয়েছে। নারী চিনি না শাহজাদি? আমার জীবনের এই মধু বসন্তের বুকের মধ্যে সাহারার মরুভূমি রচনা করেছে এই নারী।

আলেয়া। তবে এই নারীর জন্য ক্ষেপে উঠেছ কেন? কেন আমার দেবতার মত ভাইকে এমনি করে ক্ষেপিয়ে তুলেছ?

এনায়েত। কেন তুলবো না? বলেছি তো, নারীর রূপ শুধু পুরুষের ভোগের উপাদান।

ঈশা খাঁর প্রবেশ।

ঈশা খাঁ। না-না, তা তো নয়, সংসার দুঃখ-জ্বালাময়, নারী তার মধ্যে শীতল সরোবর। মাতৃরূপে যার অফুরন্ত স্নেহ সন্তানের মুখে অমৃতধারায় বয়ে যায়, পত্নীরূপে যে নারী নিজেকে নিঃস্ব করে স্বামীর মধ্যে হারিয়ে ফেলে ধন্য হয়, ভগ্নীরূপে এমনি করে মূর্তিমতী সেবার মত যে ভাইকে ঘিরে বসে থাকে, সুখ চায় না—ভোগ চায় না, চায় শুধু পুরুষের সদয় দৃষ্টি, সেই নারী যদি অসার, তবে সার কে এনায়েত?

আলেয়া। [ উল্লাসে ] এই তো মানুষ—এই তো মানুষ! দাদা! তোমায় সৃষ্টি করেছেন খোদা, আর ওই এনায়েত খাঁকে সৃষ্টি করেছে—

এনায়েত। শয়তান নিজে—[ হাসিয়া ] না?

ঈশা খাঁ। এনায়েত! তুমি ফিরে এসেছ? তা হলে বান্দা তোমায় ঠিক ধরেছিল?

এনায়েত। না, এখানে এসে শুনছি যে, তুমি আমাকে ফিরিয়ে আনতে লোক পাঠিয়েছিলে। আমি শ্রীপুরে গিয়ে তোমার পত্র চাঁদ

রায়কে দিলুম ; তারপর কি বলবো ঈশা খাঁ! এমন অপমান আমার জীবনে কখনও পাইনি।

ঈশা খাঁ। ভুলে যাও বন্ধু, আমার মুখ চেয়ে সব ভুলে যাও। অপমান তারা যতই করে থাক, সে তোমার নয়—আমার।

এনায়েত। তাই যদি হয়, সে অপমান তুমি ভুলে যাবে?

ঈশা খাঁ। হাঁ। এনায়েত! ভুলে যাবো, কারণ এ অপমান আমার প্রাপ্য।

এনায়েত। কিসের?

ঈশা খাঁ। তুমি তো জান এনায়েত! আমি বীরত্বের অহঙ্কারে চাঁদ রায়ের কন্যাকে চেয়েছিলুম। জানি না, সে কুমারী কি বিবাহিতা ; বুঝতে পারিনি যে হিন্দুরা বন্ধুত্বের অনুরোধে সব করতে পারে, কিন্তু সমাজ ত্যাগ করতে পারে না।

এনায়েত। তা হলে এখন কি করবে?

ঈশা খাঁ। আমি নিজে গিয়ে চাঁদ রায়ের কাছে ক্ষমা চাইবো।

আলেয়া। [ সোল্লাসে ] দাদা! তুমি মহান—

এনায়েত। কিন্তু আমি বলছি, তুমি ভীরু?

আলেয়া। আর বীর বুঝি তুমি? তোমার অস্ত্র বাহুবল, দাদার অস্ত্র দয়া।

[ প্রস্থান।

এনায়েত। জাঁহাপনা, এই তোমার শেষ কথা? তুমি এর প্রতিশোধ নেবে না?

ঈশা খাঁ। কিসের প্রতিশোধ বন্ধু? চাঁদ রায় কোন অন্যায় করেননি ; তোমাকে অপমান করেছি আমি, প্রতিশোধ নেবে তো আমার উপর নাও!

এনায়েত। ওঃ। এই ঈশা খাঁ বাংলার বিখ্যাত বীর ; এমন নারীর মং কোমল, এমন শিশুর মত দুর্বল। যাক, তুমি চুপ করে বসে থাকতে পার. াকন্তু আমি এর প্রতিশোধ নেবোই! আমি যুদ্ধ করবো—

ঈশা খাঁ। আমি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো।

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। জাঁহাপনা। হুকুম তামিল হলো না।

ঈশা খাঁ। কি হয়েছে বান্দা? তোমায় বড় আহত দেখছি।

বান্দা। জাঁহাপনা। শ্রীপুরের লাঠিয়ালরা লাঠির ঘায়ে আমার হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছে, আমাকে রাজবাড়ীতে যেতে দেয়নি।

ঈশা খাঁ। শ্রীপুরের অধিবাসীরা এত নিষ্ঠুর? ওঃ—চাঁদ রায়। চাঁদ রায়! আমার মনের মধ্যে তোমার গৌরবের সিংহাসন আর বুঝি থাকে না! বান্দা! চাঁদ রায় বা কেদার রায় একথা জানেন?

বান্দা। না, তাঁরা জানেন না।

ঈশা খাঁ। তবু আমি কৈফিয়ত চাইবো। বান্দা! তোমার কাছে আমি অপরাধী, আমায় ক্ষমা কর—

বান্দা। জাঁহাপনা—[ ঈশা খাঁর পায়ে মাথা নোয়াইল ]

ঈশা খাঁ। বান্দা! তারা তোমায় প্রহার করলে, তুমি প্রতিরোধ করতে পারলে না?

বান্দা। জনাবের হুকুম ছিল না।

এনায়েত। তাই পিঠ পেতে লাঠির ঘা নিয়ে এসেছ? কালীগঙ্গার জলে ডুবে মরতে পারলে না? কাপুরুষ।

বান্দা। কাপুরুষ? হুজুরালি! জাঁহাপনার হুকুম থাকলে অমন বিশটা লাঠিয়ালকে আমি মাটিতে শুইয়ে দিতে পারতুম।

ঈশা খাঁ। বান্দা। তারা তোমাকে মারেনি, মেরেছে আমাকে। তোমার দেহের ক্ষত মিলিয়ে যাবে, কিন্তু আমার অন্তরের ক্ষত শুকোবে না। যাও আমি তোমার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করছি! তুমি সুস্থ হলে তোমায় নিয়ে আমি শ্রীপুরে যাবো। যারা তোমার গায়ে লাঠি চালিয়েছে, তারাই আবার অশ্রুজলে তোমার পা ধুইয়ে দেবে!

[ বান্দার প্রস্থান।

এনায়েত। সে তো পরের কথা; এখন কি করতে চাও?

ঈশা খাঁ। কিছু না।

এনায়েত। তাহলে মনে করো না ঈশা খাঁ, যে, চাঁদ রায় কেদার রায় এতেই ক্ষান্ত হবে। তারা একদিন অতর্কিত আক্রমণে তোমার এই সোনারগাঁ দুর্গ ছারখার করে দেবে।

ঈশা খাঁ। তুমি ভুল বুঝেছ এনায়েত। তারা যোদ্ধা, কিন্তু উন্মাদ নয়।

দূতের প্রবেশ।

দূত। জাঁহাপনা! কেদার রায়ের পুত্র কাঞ্চন রায় কলাগাছিয়া দুর্গ ভস্মীভূত করেছে।

ঈশা খাঁ। কি? কি? ভস্মীভূত করেছে? কেদার রায়ের পুত্র কাঞ্চন? তারপর দুর্গাধিপ? তাঁর পত্নী, পুত্র?

দূত। সবাই পুড়ে মরেছে, কেউ বেঁচে নেই জাঁহাপনা—কেউ বেঁচে নেই!

ঈশা খাঁ। যাও—যাও, প্রতিকার করবো। [ দূতের প্রস্থান ] ওঃ, চাঁদ রায়! কি করলে তুমি চাঁদ রায়? একের অপরাধে সহস্রের প্রাণ নিলে? কি করবো—কি করবো? তার মাথা নেবো? ঈশা

খাঁর অধিকারে হস্তক্ষেপ! এতই অপরাধী ঈশা খাঁ! চাঁদ রায় ঈশা খাঁকে চেনে না। চিনিয়ে দেবো একবার, চিনিয়ে দেবো চাঁদ রায়?

এনায়েত। এখনও দ্বিধা?

ঈশা খাঁ। না—দ্বিধা নেই। চল, চাঁদ রায়ের সাধের শ্রীপুর উপড়ে ফেলে কালীগঙ্গার জলে ফেলে দেবো। না, চাঁদ রায়ের চেয়েও বেশী অপরাধী আমি; আগে নিজের উপর প্রতিশোধ নেবো, তারপর চাঁদ রায়।

দূতের প্রবেশ।

দূত। জাঁহাপনা! চাঁদ রায়ের সৈন্যাধ্যক্ষ কার্ভালো ত্রিবেণীর দুর্গ অধিকার করেছে।

ঈশা খাঁ। কি? ত্রিবেণীর দুর্গ অধিকার করেছে? চাঁদ রায়ের সৈন্যাধ্যক্ষ? ওঃ, চাঁদ রায়! তোমার গায়ের চামড়া উপড়ে নিলেও এর প্রতিশোধ হয় না। যাও দূত! [ দূতের প্রস্থান ] এনায়েত! আমি যুদ্ধ করবো; এমন যুদ্ধ, যা কেউ দেখেনি। চাঁদ রায়ের রক্ত চাই—কেদার রায়ের মাথা চাই—কাঞ্চনের কবন্ধ চাই!

এনায়েত। হ্যাঁ—এইবার সাধ হচ্ছে, তোমায় বীর বলে আলিঙ্গন দিতে।

ঈশা খাঁ। আগে কোন দিকে যাবো? শ্রীপুর না ত্রিবেণী, না কলাগাছিয়া? কোন পথে, বল—কোন পথে?

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। স্বর্ণদ্বীপের পথে?

এনায়েত। কে?

শ্রীমন্ত। ছিলুম একদিন চাঁদ রায়ের গুরু, আজ তার পরম শত্রু!

ঈশা খাঁ। কি বলতে এসেছ? বল, আর কি দুঃসংবাদ আছে? তুমিও কি একবার দংশন করতে চাও?

এনায়েৎ। চাঁদ রায় কেদার রায় কোথায়?

শ্রীমন্ত। স্বর্ণদ্বীপ ধ্বংস করতে গেছে।

ঈশা খাঁ। স্বর্ণদ্বীপ? উত্তম, আমি যাচ্ছি। চাঁদ রায়! তুমি ঈশা খাঁর আসল রূপ দেখনি, এইবার দেখবে। এনায়েৎ! প্রস্তুত হও, এখনি আমরা স্বর্ণদ্বীপ যাত্রা করবো। চাঁদ রায়কে দেখিয়ে দিতে হবে যে, ঈশা খাঁ মরেনি, বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ঈশা খাঁর বুকটা পাথর দিয়ে গড়া নয়, আগুন তাকে জ্বালিয়ে তোলে—মানুষের বিশ্বাস-ঘাতকতায় তার মধ্যে তীব্র অনুভূতি জাগে। চল—চল।

শ্রীমন্ত। সোনাকে চাই?

ঈশা খাঁ। সোনা—সোনা? গুরুজি আমার বুকটা ছিঁড়ে যদি দেখাতে পারতুম, দেখতে তার নাম প্রস্তরফলকে আঁকা, কিন্তু তাকে পাবার নয়—

শ্রীমন্ত। আমি যদি এনে দিই?

ঈশা খাঁ। বিশ্বাসঘাতক। [ তরবারি নিষ্কাসন করিয়া ] না—কিসের বিশ্বাস? সংসার অবিশ্বাসে ভরা। চাঁদ রায়ের বিশ্বাস আমি ভঙ্গ করেছি, আমার বিশ্বাসের মূলে চাঁদ রায় কুঠারাঘাত করেছে, তুমি তার গুরু—অখণ্ড বিশ্বাসের পাত্র, তুমিই বা বাদ যাবে কেন? জ্বলুক আগুন—জ্বলুক আগুন! ব্রাহ্মণ! আমি সোনাকে চাই। চাঁদ রায়ের বুকে এমন বাজ হানবো যে, তার গর্বিত অন্তর দিবানিশি ত্রাহি-ত্রাহিরবে আর্তনাদ করবে।

[ প্রস্থান।

এনায়েৎ। চাঁদ রায়! এইবার দেখবো তুমি কত বড় বীর!

[ প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। খোকা! দাঁড়া, এইবার তোর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবো—

গীতকণ্ঠে সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন।—

### গীত

তুই উল্টা বুঝিলি রাম!
পরের পীরিতে আপনা বাঁধিয়া যাবে কুল যাবে শ্যাম।

শ্রীমন্ত। কে তুই?

সনাতন।—

### পূর্ব গীতাংশ

আমি আদিম কালের চির পুরাতন,
আপনার চেয়ে আমি যে আপন,
তোর জনক-জননী জপ করে গেছে আমারি এ শুধা নাম।

শ্রীমন্ত। জনক-জননী জপ করে গেছেন, আমি জপ করবো না।

সনাতন।—

### পূর্ব গীতাংশ

তুই বামুনের ঘরে দুরন্ত গরু, শ্যামল ভূমিতে সাহারার মরু,
আপনার হাতে আপনি ভাঙ্গিছ সুখের স্বরগধাম।

[ প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। না—না, প্রতিশোধ—প্রতিশোধ চাই।

[ প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

দেবলের বাটী

একটি মোহরের থলি লইয়া দেবলের প্রবেশ।

দেবল। এঁ্যা—দাদা বললে কি করে? সোনাকে ভুলিয়ে আনতে হবে, তার জন্যে এই ঘুষ? দেখি—[ থলির বাঁধন খুলিতে খুলিতে ] গিন্নীকে বলা হবে না, বললেই সব মাটি করবে! মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকে না; উঁহুঁ—কিছুতেই বলা হবে না। আচ্ছা, থলেটা ফেরৎ দেবো? তাই দিই! টাকা খেয়ে সোনাকে ভুলিয়ে আনবো, সে আমি পারবো না বাবা! তা একবার খুলেই দেখি—[ থলি খুলিয়া ] এঁ্যা—এ যে বিলকুল মোহর! দাদা এই মোহরগুলো আমায় দিলে? বাপরে—বাপরে—বাপরে বাপ! এ যে যত দেখছি, তত আমার নাচ পাচ্ছে।

জগদম্বার প্রবেশ।

জগদম্বা। কি গা? তোমার হাতে ও কি?

দেবল। উঁহুঁ, বলা হবে না, মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকে না।

জগদম্বা। লুকোচ্ছ কেন? কি ও?

দেবল। আরে, সে খোঁজে তোমার দরকার কি? গোটা কতক ইঁদুরবাচ্ছা ধরে এনেছি অম্বল খাবো বলে।

জগদম্বা। আ মলো যা, ইঁদুরের অম্বল কেউ খায়?

দেবল। আরে অম্বল না—অম্বল না, ইঁদুরের আচার হবে। তোমার

এই অরুচির সময় না? একটু একটু আচার খাবে—তোফা লাগবে। [ প্রস্থানোদ্যত ]

জগদম্বা। দূর মুখপোড়া, আমি কচি খুকি না কি? আমায় বোকা বোঝাচ্ছ? বলি, পালাচ্ছ কোথায়? দেখি না, কি আছে?

দেবল। কিছু না—কিছু না।

জগদম্বা। কিছু না তো লুকোচ্ছ কেন?

দেবল। [ স্বগত ] তাও তো বটে! এখন বলিই বা কি?

জগদম্বা। দাও না দেখি, এক ছিলিম তামাক সেজে খাওয়াবো'খন!

দেবল। [ সহাস্যে থলিটি জগদম্বার হাতে দিয়া ] সাবধান, কেউ না জানে!

জগদম্বা। উঁহু, কাক-পক্ষী জানবে না। [ খুলিয়া দেখিয়া ] ওগো, এ যে মোহর—

দেবল। চুপ—চুপ!

জগদম্বা। ওগো, এ যে অনেক মোহর—

দেবল। চুপ—চুপ।

জগদম্বা। এত মোহর তুমি কোথায় পেলে গো?

দেবল। আরে, চুপ কর না?

জগদম্বা। কেন চুপ করবো? কখ্খনো চুপ করবো না। আমি কারও খাই না পরি? ওগো, আমার যে কান্না পাচ্ছে! এত মোহর নিয়ে আমি কি করবো গো—

দেবল। মাটি করলে! আঃ—আরে চুপ, কেউ শুনলে বিপদ হবে।

জগদম্বা। তাই নাকি? তা এ সব দিলে কে?

দেবল। বলা হবে না, সে ভয়ানক কথা।

জগদম্বা। কি রকম? কি রকম?

দেবল। না-না, অমনি কুড়িয়ে পেয়েছি। তোমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের কি সব কথা বলতে আছে? সে ভয়ানক কথা।

জগদম্বা। কি রকম ভয়ানক?

দেবল। সাংঘাতিক ভয়ানক।

জগদম্বা। কেমন সাংঘাতিক গো?

দেবল। ভীষণ সাংঘাতিক।

জগদম্বা। দূর মুখপোড়া! কথাটা কি, তাই শুনি না। আমার যে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে শোনবার জন্যে।

দেবল। আরে আমারও পেটে মোচড় দিয়ে উঠছে বলবার জন্যে।

জগদম্বা। তবে বলে খালাস হও না।

দেবল। বলবো? আচ্ছা, শোন, কিন্তু কাউকে বলো না যেন, তা হলে আমার গর্দান যাবে।

জগদম্বা। বাপরে, তা হলে কি বলতে পারি! তোমার গর্দান গেলে আমি যে গয়না পরতে পাবো না—মাছ খেতে পাবো না!

দেবল। ওঃ—ওর মাছের শোক উথলে উঠলো! যাও—আমি বলবো না।

জগদম্বা। বল—বল, নইলে আমার প্রাণ গেল—

দেবল। তবে শোন, টাকা দিয়েছে দাদা—সে আবার পেয়েছে ঈশা খাঁর কাছে।

জগদম্বা। ঈশা খাঁ? সে দেখতে কেমন?

দেবল। হাত্তোর গুষ্টির পিণ্ডি! আমি কি তাকে দেখেছি?

জগদম্বা। তারপর? তোমার দাদা তোমাকে টাকা দিলে কেন?

দেবল। আরে সেইটেই তো আসল কথা! ওই যে রাজবাড়ীর—উঁহুঁ, বলা হবে না, মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকে না।

জগদম্বা। প্রাণ গেল—প্রাণ গেল, শীগগির বল—

দেবল। ওই যে রাজবাড়ীর সোনা না? ওই সোনাকে ভুলিয়ে দাদার হাতে এনে দিতে হবে, দাদা আবার তাকে—বুঝেছ?

জগদম্বা। তাই নাকি? ও মিনসে আমাকে পছন্দ করে না? সোনা না গিয়ে আমি যদি যাই?

দেবল। আরে তা হলে তো গোলই ছিল না! এই সোনাকে নিয়েই তো বিপদে পড়েছি! নাঃ—থলে দাও, ফেরত দেবো—

জগদম্বা। ফেরত দেবে কি গো! আমি যে মনে মনে গয়না গড়িয়ে রেখেছি।

দেবল। মরে যাই আর কি। দাও—দাও, শীগগির দাও! আমি হচ্ছি গুরু, এ কাজ করতে আছে? গর্দান যাবে।

জগদম্বা। গেলই বা! এ যে অনেক মোহর! তোমার গর্দানের কি এর চেয়ে বেশী দর উঠবে না কি?

দেবল। এঁ্যা! এ বলে কি? সোয়ামীর চেয়ে টাকা বড়? ও বাবা, টাকা এমন শত্রু! হাত্তোর টাকার গুষ্টির মুখে আগুন! দাও—দাও, থলে দাও—

জগদম্বা। এই—এই, খবরদার মিনসে! চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করবো বলছি।

দেবল। ওরে বাবা এ কি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! আমার গর্দান যাবে যে!

জগদম্বা। কেন গর্দান যাবে? ভোল বদলে পালাই চল। দিন কতক গা-ঢাকা দিয়ে আবার আসবো! আর গর্দান্ যদি যা ই,

দুঃখ কি? আমি বেশ করে পা ছড়িয়ে কাঁদবো'খন। যাও—যাও, তামাক খাও গে যাও, তারপর পরামর্শ করা যাবে।

দেবল। মেয়েমানুষকে যে বিয়ে করে, সে শালা।

[ প্রস্থান।

জগদম্বা। সোনা বড়ঠাকুরকে নিয়ে উড়বে! সাধে কি আর সোনার বিয়ে হবে বলে ওঁর গা চিড়বিড়িয়ে উঠেছিল? যাক গে, বড় ঘরের বড় কথা; আমার ও সব আলোচনার দরকার কি? কিন্তু পেট যে কথার ভারে ফেঁপে উঠছে। ইস, চোঁয়া ঢেকুর উঠছে আবার—হে-উ! যার যা খুসী করুক—হে-উ! না, এ যে নাড়ী-ভুঁড়ি কচলাতে সুরু করলে—হে-উ! আমি কারও সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—হে-উ! কি হলো? আমার যে ডাক ছেড়ে চ্যাঁচাতে ইচ্ছে করছে! ওগো, আমার এ কি হলো গো—

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। কি গা?

জগদম্বা। কিছু শুনেছিস নাকি? শুনিস নে—শুনিস নে, ও সব বড় ঘরের বড় কথায় আমাদের দরকার কি—হে-উ। আবার না কি বললে কর্তার গর্দান যাবে। হে উ—

দাসী। কথাটা কি গা?

জগদম্বা। আরে না-না, ও সব না শোনাই ভাল; বললে আমার কর্তার গর্দান যাবে। দরকার কি? হে-উ! সোনা যদি বড়ঠাকুরকে নিয়ে বেরিয়ে যায়—হে-উ—তা তোরই বা কি, আমারই বা কি? থলে ভরা মোহর দিয়েছে বলেই উনি রাজকন্যাকে ভুলিয়ে আনতে পারেন কি? হে-উ। ও সব শুনিস নে, ভয়ানক কথা।

দাসী। মা গো মা—অবাক কাণ্ড! [ প্রস্থান।

জগদম্বা। যাক অনেকটা হাল্কা হলো। কে যায়? [ সম্মুখস্থ পথে ফকির-ফকিরণীকে দেখিয়া ডাকিল ] ও ফকির! ও ফকির! একটা গান গেয়ে যাও না—

ফকির-ফকিরণীর বেশে দিলপিয়ার ও
গুলবাহারের প্রবেশ।

জগদম্বা। তোমাদের ঘব কোথায় গা? ওই ওপারে বুঝি?

দিলপিয়ার। হ—হ মা-ঠারাইন, আমাগ বাড়ী হেই ওপার!

জগদম্বা। তা তোমাদের ওপারের লোক সব ভাল। এ পারের লোক—মুয়ে আগুন! তুই হলি গিয়ে রাজকন্যে—না—না, ওসব কথায় তোমাদের কান দেবার দরকার নেই। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, মুয়ে আগুন! শেষকালে কি না গুরুঠাকুরকে নিয়ে—

গুলবাহার। কি গা মা-ঠাকরুণ? রাজকন্যা বলে কি বলছো?

দিলপিয়ার। তর হেই কথায় দরকার কি?

জগদম্বা। ছেড়ে দাও না, বড় ঘরের বড় কথা! তোমাদের নাম কে গা?

দিলপিয়ার। আইজ্ঞা মা ঠারাইন, আমার নাম দিলপিয়ার বট্টাচার্য, আর ওর নাম গিয়া বাহারসুন্দরী দাইস্যা।

জগদম্বা। এ কি রকম নাম গো?

গুলবাহার। কি জান মা-ঠাকরুণ! থাকি মোছলমানের পাড়ায়, নাম তেমনি হয়েছে।

জগদম্বা। যাই হোক বাছা, পরের কথায় থেকো না। রাজকন্যা বেরিয়ে যাক কি থাক, তোমাদের কি?

দিলপিয়ার। হ—হ মা-ঠারাইন, আমি হেই বুঝি।

গুলবাহার। থাম বাঙ্গাল! [ জগদম্বার প্রতি ] কোন রাজকন্যা গা? সোনা?

দিলপিয়ার। এঁ্যা? কও কি মা-ঠারাইন?

জগদম্বা। দরকার কি বাছা, আমাদের ওসব কথায়? গুরু-ঠাকুরের সঙ্গে বেরিয়ে যাক, কি যার সঙ্গে খুসী, না—না, এসব ভাল কথা নয়; বললে আবার কর্তার গর্দান যাবে! ঘুষ দিয়ে মুখ মেরে দিয়েছে কি না!

গুলবাহার। গুরুঠাকুরের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে?

দিলপিয়ার। এঁ্যা!

জগদম্বা। বেরিয়ে যাবে কি গো—গেছে।

দিলপিয়ার। এঁ্যা! বাহার! মারছে কপালে পিছার বাবি। আর কি? এইবার—[ তুড়িলাফ ]

জগদম্বা। তা এসেছ, একখানা গান গাও।

দিলপিয়ার। আর ছালি গাইমু ঠারাইন!

**গীত**

হায় রে সব এক গোয়ালের গরু।
এক খোঁয়ারে পড়লো বাঁধা ছোড় আর ঐ বড়ু।
এক দরে যায় মিশ্রী মুড়ি, নূরবেগম আর রামার খুড়ি,
পচা খালে মরলো ডুবে বাদশাজাদার জরু।
এ পিঠ ও পিঠ যতই দেখি, দুনিয়াদারির সবই মেকি,
সব শেয়ালের একই বুলি মোটা কিম্বা সরু।

[ সকলের প্রস্থান।

———

## চতুর্থ দৃশ্য

শ্রীপুর-প্রাসাদ

গীতকণ্ঠে চম্পকের প্রবেশ।

### গীত

চম্পক।—ব্রজের কানু, ব্রজের কানু, তুমি ধেনু চরাও কোন বনে?

গীতকণ্ঠে সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন।—নিত্য যেথায় আমার পূজা পুষ্প-তুলসী বর্ষণে।

চম্পক।—আমি-বনমালা হাতে সদা দিনে রাতে খুঁজি হে তোমারে প্রিয়,

সনাতন।—সে যে আছে কাছে কাছে আকাশে বাতাসে দোলে তার উত্তরীয়,

চম্পক।—আমায় কে বোঝাবে তব মর্ম?

সনাতন।—ওরে শুধু সনাতন ধর্ম,

চম্পক।—আমি নামের পাগল রূপের পিয়াসী চমকি ভ্রমরগুঞ্জনে।

সনাতন।—চোখ মেলে চাও এই গোঠে তার নাচে ধেনু পদশিঞ্জনে।

[ সনাতনের প্রস্থান।

কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। চম্পক!

চম্পক। দাদা—[ কাঞ্চনের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল ]

কাঞ্চন। [ চম্পকের দুই গণ্ডে চুম্বন করিয়া ] চোখে জল কেন? আবার বুঝি 'বনমালী' 'বনমালী' করছিলি? ওই বনমালীই তোকে মাটি করবে।

চম্পক। [কোল হইতে নামিয়া] তুমি ভারী বোঝ? বনমালী কাউকে মাটি করে বুঝি? তাকে যে ভালবাসে—

কাঞ্চন। তার ভিটেয় বাতি জ্বলে না।

চম্পক। দাদা! আমায় রাগিও না বলছি!

কাঞ্চন। আরে ছোড়া, 'বনমালী' 'বনমালী' করে তুই কি পাগল হবি? ও তো শুনি মানুষকে খালি কাঁদায়। ওর পিসী যশোদা ওকে মানুষ করেছিল—

চম্পক। যশোদা বুঝি কৃষ্ণের পিসী?

কাঞ্চন। নেই তো নেই। তুই মোটের উপর এ পাগলামি আর করতে পাবিনে—বুঝলি?

চম্পক। কেন দাদা, তুমি দিনের মধ্যে একশোবার এই কথা বল?

কাঞ্চন। আরে ছোঁড়া, বলি কি সাধে? তুই হলি কেদার রায়ের ছেলে, যার নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়। তোকে তো ঠাকুরপূজো করতে হবে না, করতে হবে যুদ্ধ। তাজা তাজা মানুষের মাথা ভাঙবি, কাটা মুণ্ডু থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে—আশ মিটিয়ে স্নান করবি, রাতের বেলা যুদ্ধক্ষেত্রে মড়া শিয়রে রেখে শুয়ে থাকবি। তা তুই ভাবিসনি চম্পক। আমি তোকে শিখিয়ে দেবো কেমন করে মানুষের মাথা ভাঙতে হয়।

চম্পক। আমি শিখবো না।

কাঞ্চন। আলবৎ শিখবি। চাঁদ রায়ের ভাইপো আমরা—কেদার রায়ের ছেলে, আমাদের কি ঘরের কোণে বসে প্যান-প্যান করা সাজে? ছিঃ ভাই, ছিঃ। দেশে এত অত্যাচার, ঘরে এত অশান্তি দেশের লোকের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় জোটে না, রোগে শোকে অনাহারে দেশের পাঁজরা খসে যাচ্ছে, এই কি আমাদের

পুতুলখেলার সময়? গরীবের পেটে ভাত দিতে হবে—আততায়ীর টুঁটি কামড়ে ধরতে হবে; দেশে কেউ গরীব থাকবে না—কেউ অকালে মরবে না—কারও জিনিস কেউ চুরি করবে না—

চম্পক। মানুষের মাথায় লাঠি চালিয়ে দেশে শান্তি আনবে দাদা? তা তো হয় না। গুরুদেব বলেছেন—

কাঞ্চন। খবরদার! গুরুদেব শালার নাম আর আমার কাছে করিসনি।

চম্পক। ছিঃ-ছিঃ, তুমি হলে কি দাদা?

কাঞ্চন। তলোয়ার নিয়ে আয়, আমি তোকে যুদ্ধ শেখাবো।

চম্পক। আমি শিখবো না।

কাঞ্চন। নিশ্চয় শিখবি। কেদার রায়ের ছেলে যুদ্ধ শিখবি না, চালাকি?

চম্পক। কখখনো শিখবো না।

কাঞ্চন। তবে দূর হয়ে যা। [ কান ধরিয়া বাহির করিয়া দিল ] যুদ্ধ করবে না! ভারী আবদার।

স্বর্ণময়ীর প্রবেশ।

স্বর্ণময়ী। সবাই কি যোদ্ধা হয়! একজন আঘাত করবে, আর একজন প্রলেপ দেবে, একজন ধরবে অসি, আর একজন বাজাবে বাঁশী, একজন তার সবল বাহু দিয়ে দেশের পর দেশ জয় করে আসবে, আর একজন ফল জল শস্য দিয়ে তার ললাটে লক্ষ্মীর রাজটীকা পরিয়ে দেবে। সংসারে দু'জনেরই সমান প্রয়োজন দাদা!

কাঞ্চন। বা রে বাঁদরমুখী, তুই যে মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠেছিস! তুইও বনমালীর নামে পাগল হয়ে উঠেছিস না কি?

স্বর্ণময়ী। আমার এমন কি পুণ্য আছে দাদা যে তাঁর নামে পাগল হবো ?

কাঞ্চন। তবে তোর চোখ ছল-ছল করছে কেন ?

স্বর্ণময়ী। একটা কথা শুনলুম। দাদা! আমায় লুকিয়ো না ; বল, সহসা তোমরা এমন যুদ্ধ-যুদ্ধ করে ক্ষেপে উঠেছো কেন ? এ কি আমার জন্য ?

কাঞ্চন। কে বললে ? না—না, তোর জন্য তো নয় !

স্বর্ণময়ী। তবে ? সহসা কি এমন কারণ ঘটলো যে, বাবা কাকাকে নিয়ে স্বর্ণদ্বীপ জয় করতে ছুটলেন কেন, তুমি কলাগাছিয়া দুর্গটা ছাই করে দিয়ে এলে, কার্ভালো ত্রিবেণী দুর্গ জয় করে শত শত নরনারীর মাথা নিয়ে ফিরে এলো ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না দাদা ! আমায় বল, আমার মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কাঞ্চন। আরে দূর ! মন চঞ্চল হবে আমার, তোর হতে গেল কেন ? কি হয়েছে, জানিস না বুঝি ? ঐ ঈশা খাঁ তার বোনকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। আমিও বিয়ে করবো না—সেও ছাড়বে না ; এই আর কি !

কেশার মার প্রবেশ।

কেশার মা। হ্যাঁ রে কাঞ্চন, চম্পককে মেরেছিস ?

কাঞ্চন। এই নাও ! ও বুঝি লাগিয়েছে, আর তুই অমনি কোঁদল করতে এলি ?

কেশার মা। মেরেছিস কি না, তাই বল ?

কাঞ্চন। হ্যাঁ—মেরেছি, আবার মারবো।

কেশার মা। খবরদার ! কচি ছেলের গায়ে হাত তুলবিনি। ওঃ,

ভারী যুদ্ধ শিখেছে! গোটা কতক মড়ার খুলি ভাঙ্গলেই যুদ্ধ হয়ে গেল! আমার সঙ্গে লড়তে পারিস? আয় না, দেখি তুই কত বড় মরদ, আর আমিই বা কেমন মেয়েমানুষ!

কাঞ্চন। কে তোকে মেয়েমানুষ বলে? তুই মেয়েমানুষের বাবা। তোর যদি একটা কাচা আর একজোড়া গোঁফ থাকতো, তাহলে ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে তোকেই পাঠাতুম।

দেবলের প্রবেশ।

দেবল। সোনা—সোনা—

সকলে। কি ঠাকুর?

দেবল। আমি একটা কথা বলতে—মানে একটা কথা—এই সোনাকে—না—না, আমি বলতে পারবো না—আমাব মাথা ঘুবছে—

কেশার মা। খুব তামাক খেয়েছ বুঝি?

দেবল। না—না, আজ আমি সারাদিন কিছু খাইনি। সোনা! এই তোমাকে একটা কথা—তাই তো, আমার মাথাব ভেতর সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না—

স্বর্ণময়ী। ঠাকুর! আপনার কি কোন অসুখ করেছে?

দেবল। না—না, অসুখ করেনি, শুধু আমার জিভটা জড়িয়ে আসছে—

কাঞ্চন। যাও ঠাকুব—যাও, পাগলামি করো না।

দেবল। পাগলামি নয়—ওরে পাগলামি নয়; আমি বলতে পারছি না—বোঝাতে পারছি না—

কাঞ্চন। আর বোঝাতে হবে না ঠাকুর! তুমি পথ দেখ।

স্বর্ণময়ী। বলতে দাও না দাদা। দেখছো না ওর চোখ দুটো?

কাঞ্চন। গাঁজা খেয়েছে।

দেবল। না-না-না। কোটীশ্বর! আমি বলতে পারছি না, তুমি বুঝিয়ে দিও। সোনা! কাউকে বিশ্বাস করো না—কাউকে বিশ্বাস করো না— [ প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। কেশার মা! দেখ তো—দেখ তো, ঠাকুর কোথায় যাচ্ছেন! উনি যেন কি একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছেন, কিন্তু বলতে পারছেন না।

কেশার মা। তাই তো! আচ্ছা দেখি—

[ প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। কেন আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হচ্ছে? দাদা! কি যেন একটা অমঙ্গলের মেঘ আমাদের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে আসছে।

কাঞ্চন। আসুক অমঙ্গল, অমঙ্গলকে চিরকাল অঙ্গভূষণ করবো।

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। কুমার—কুমার!

কাঞ্চন। কি কাকা?

কেশরী। ঈশা খাঁ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে স্বর্ণদ্বীপের দিকে ছুটেছে।

কাঞ্চন। পঞ্চাশ হাজার? তাইতো কাকা। আমাদের যে মোটে দশ হাজার, তাও শিক্ষিত নয়। তাহলে এখন কি করা যায়?

কেশরী। চল আর একবার কতগুলো মানুষের মাথা ভেঙ্গে আসি। আমি একবার লাঠি ধরে দাঁড়ালে হাজার সৈন্যকে ঘায়েল করবো। যাক্ আর দেরী নয়, চলো এগোই কুমার।

কাঞ্চন। আমারও আর এমনি [illegible] দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল

লাগছে না। ঈশা খাঁর মাথাটা ছিঁড়ে আনতে না পারলে এ জীবনে সুখ নেই। কাকা—

স্বর্ণময়ী। শুধু ধ্বংসের কল্পনা নিয়েই ব্যস্ত। ভগবান! কেন মানুষের প্রাণে নিষ্ঠুরতা দিয়েছ?

কেশরী। তাহলে আর দেরী নয় কুমার। আজ যাওয়া চাই—

কাঞ্চন। আজ কেন—এখনি!

স্বর্ণময়ী। দাদা! আবার তোমরা যুদ্ধে যাচ্ছ? এই সেদিন কতকগুলো নর-নারীকে বিনাদোষে জল্লাদের মত হত্যা করে এলে, তাতেও সাধ মিটলো না? ওঃ—তোমরা কি নিষ্ঠুর!

কাঞ্চন। যা—যা, বুড়োমী করিসনে বাঁদরী!

স্বর্ণময়ী। দাদা! মানুষের মাথা ভেঙ্গে তুমি কি এতই নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছ? ভাই-বোনকেও একটা মিষ্টি কথা বলতে জান না? [ ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল ]

কাঞ্চন। আরে, কাঁদে দেখ! যাঃ—সব গোলমাল করে দিলে। এই, কাঁদিসনি বলছি। দেখ দেখি আমি এখন কি করি? সোনা! দেবো মাথাটা ঠুকে?

কেশরী। কুমার—

কাঞ্চন। হ্যাঁ—চল, কিন্তু এভাবে নয়! আমি সোজা পথে স্বর্ণদ্বীপে চলে যাই, আর তুমি ছদ্মবেশে গিয়ে ঈশা খাঁর বজরা ভুলিয়ে অন্য পথে নিয়ে যাও। মাত্র সাত দিন যদি দেরী করিয়ে দিতে পার—ব্যস!

কেশরী। তাহলে আমি একবার মাকে বলে আসি—

[ প্রস্থান।

কাঞ্চন। ঈশা খাঁর মাথাটা অনেক দামে বিকাবে, একবার ছিঁড়ে

[illegible]য়! সোনা! তা হলে তুই মুখ ফিরিয়ে থাক, আমি চললুম—

ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। আবার কোথায় চলেছ বাবা?

কাঞ্চন। স্বর্ণদ্বীপে।

ভবানী। যেতে হবে না।

কাঞ্চন। না গেলে চলবে না তো।

ভবানী। খুব চলবে। এই সেদিন কলাগাছিয়া থেকে ফিরে এসেছ, এখনও দেহের ক্ষত মিলিয়ে যায়নি, আবার যুদ্ধ? তোমরা কি শুধু যুদ্ধই চিনেছ? না—তোমাকে আমি এমন করে যমের সঙ্গে খেলা করতে দেবো না।

কাঞ্চন। আমি যে মা চাঁদ রায়ের ভাইপো—কেদার রায়ের ছেলে, যমের সঙ্গে খেলা করাই যাঁদের ধর্ম।

ভবানী। তাঁদের ধর্ম নিয়ে তাঁরা থাকুন, তোমাকে আমি আজ আর যুদ্ধে যেতে দেবো না কাঞ্চন!

কাঞ্চন। মা! আমার মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দোহাই মা তোমার, আমায় শুধু এক পক্ষের ছুটি দাও। তুমি আমার জন্মোৎসবের আয়োজন কর, আমি যেখানেই থাকি, সে দিন নিশ্চয়ই এসে তোমার পায়ের ধুলো নেবো!

ভবানী। মনে [illegible]? আচ্ছা যাও, কোটীশ্বরকে প্রণাম করে যাত্রা কর।

কাঞ্চন। কোটীশ্বর মাথায় থাক মা, আমি তোমাকেই একটা প্রণাম করে যাচ্ছি। [ প্রণাম ] সোনা—সোনা! কথা বললিনি

পোড়ারমুখী? যাবার সময় মুখ ফিরিয়ে রইলি? যদি আর দেখা না হয়, কেঁদে মরে যাবি। [ প্রস্থান।

ভবানী। কাঞ্চনকে একটা কথাও বললিনি সোনা?

স্বর্ণময়ী। না মা, দাদা আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

ভবানী। তাই বটে! কি করে বললি সোনা? মুখের ভাষাটাই বড়, অন্তরের কথাটা কিছুই নয়। এমন ভাই কে কবে পেয়েছে? শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় সুভদ্রাকে এর চেয়ে বেশী ভালবাসতো না।

স্বর্ণময়ী। মা! তুমি কি বলছো?

ভবানী। কার জন্য অতটুকু ছেলে কলাগাছিয়া দুর্গ ধ্বংস করে সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে এলো? কার জন্য আজ আবার নাচতে নাচতে যমের মুখে ছুটে গেল?

স্বর্ণময়ী। কার জন্য মা!

ভবানী। তোমার জন্য।

স্বর্ণময়ী। মা! কি হয়েছে মা, আমায় খুলে বল। লোকে আমায় দেখে কানাকানি করে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার যেন মনে হচ্ছে আমায় নিয়ে চারিদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলছে! তোমার পায়ে পড়ি মা, আমায় বল, না শুনে আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না! মা—মা—

ভবানী। বেঁচে থাকলে একদিন শুনতে পাবে; আজ নয় মা, আর একদিন বলবো। এসো মা, কোটীশ্বরের পূজার বেলা বয়ে যাচ্ছে। [ প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। কোটীশ্বর! মনের চঞ্চলতা দূর কর দয়াময়!

[ প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্বর্ণদ্বীপ-দুর্গের সম্মুখস্থ পথ

গভীর রাত্রি

গীতকণ্ঠে পলায়মান নাগরিক ও নাগরিকাগণের
তল্পী-তল্পা লইয়া প্রবেশ।

সকলে।—

### গীত

হায় রে খোদাতাল্লা।
উলুখড়ের জান নিতে কি রাজায় রাজায় পাল্লা?
ছক গরু সব মরেছে, আমরা কেন রইনু বেঁচে,
সব হারিয়ে নাচছি আজ ফকিরী আলখাল্লা।
হায় রে হায় সোনার দেশে কে এলো সর্বনেশে,
কবর দেছে পীর হকে হায় কৃষাণ মাঝি মাল্লা।

[ সকলের প্রস্থান।

সশস্ত্র ঈশা খাঁ ও এনায়েতের প্রবেশ।

ঈশা খাঁ। নীরব—নীরব—কোথাও একটা সাড়াশব্দ নেই, যে দিকে চাই, শুধু শবের উপর শব! রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে! কি দুর্গন্ধ—নিঃশ্বাস আটকে আসছে! দেখছো এনায়েৎ, সমস্ত স্বর্ণদ্বীপ যেন মৃত্যুর মত নিথর হয়ে পড়ে আছে। কেউ কি বেঁচে নেই? কেউ কি বেঁচে নেই এনায়েৎ? চাঁদ রায়, কেদার রায় কি সবাইকে বধ

করেছে? ওঃ—কেন দু'দিন আগে আসতে পারিনি? কুচক্রীর কথায় ভুলে কেন বিপথে চলে গেলুম? খোদা—খোদা! তুমিও কি মুখ ফিরিয়েছ ?

এনায়েত। আস্তে—আস্তে বন্ধু, হয় তো তারা কোথাও লুকিয়ে আছে। নগর তো গেছেই, তোমাকেও আর বাঁচাতে পারবো না।

ঈশা খাঁ। আরও বাঁচতে হবে এনায়েত? কলাগাছিয়া গেল, ত্রিবেণী গেল, তবুও আমায় বেঁচে থাকতে হবে এনায়েত? না—না, আমি মরবো; সবাই তো গেছে, তাই বুকটাও চাঁদ রায়ের সম্মুখে উন্মুক্ত করে বলবো—নিষ্ঠুর ঘাতক! আমার প্রাণাধিক প্রজাদের যে পথে পাঠিয়েছ, আমাকেও সেই পথে যেতে দাও।

এনায়েত। উন্মাদ হয়ো না বন্ধু! আমরা এর ভীষণ প্রতিশোধ নেবো।

ঈশা খাঁ। প্রতিশোধ নেবো—প্রতিশোধ নেবো এনায়েত! চাঁদ রায় কেদার রায়কে মাটির সঙ্গে পিষে ফেলতে পারি, কিন্তু যাদের হারিয়েছি, তারা তো আর ফিরবে না।

এনায়েত। তবু তারা বেহেস্ত থেকে দেখে সুখী হবে যে, তুমি তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছ। স্থির হও বন্ধু! এ দৌর্বল্য তোমার সাজে না।

ঈশা খাঁ। তুমি বুঝবে না—তুমি বুঝবে না এনায়েত, কি জ্বালা এ অন্তরের মাঝখানে! কত জাতির ইতিহাস মন্থন করে, কত যুগের আদর্শ নিয়ে আমি এই তিনটে নগর ফলে ফুলে সাজিয়েছিলুম! তারা দুর্গ অধিকার করেছে, তাতে দুঃখ ছিল না—যদি বেঁচে থাকতো আমার প্রজারা।

এনায়েত। ঈশা খাঁ! তোমার চোখে জল দেখছি! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ,

এই নারীসুলভ দুর্বলতা নিয়ে তুমি চাঁদ রায়ের বিপক্ষে দাঁড়াবে? ফুৎকারে উড়ে যাবে ঈশা খাঁ!

[ প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। ও কি? দুর্গচূড়ায় ও কার পতাকা উড়ছে?

সশস্ত্র কেদার রায়ের প্রবেশ।

কেদার। হিন্দুর পতাকা—চাঁদ রায়ের পতাকা—

ঈশা খাঁ। কে—কেদার রায়?

কেদার। 'বন্ধু' বলবে না বিশ্বাসঘাতক—

ঈশা খাঁ। আমি বিশ্বাসঘাতক, আর তুমি বড় সাধু! পুত্রকে লেলিয়ে দিয়ে নিশীথ রাত্রে আমার কলাগাছিয়া দুর্গ ভস্মে পরিণত করেছ, সে বড় সাধুতার পরিচয়? আমার অজ্ঞাতসারে নিরীহ প্রজাদের রক্তে স্বর্ণদ্বীপের শ্যামল ভূমি রঞ্জিত করেছ, এও বড় সাধুতার পরিচয়? কি করবো তোমায় কেদার রায়? আমার বুকে এমন আগুন জ্বালিয়েছ তোমরা যে, তোমাদের শ্রীপুরের সহস্র বিধবা যদি অশ্রুজলে নদী বইয়ে দেয়, তবুও এ আগুন নির্বাপিত হবে না।

কেদার। আর তুমি কি করেছ, মনে আছে ঈশা খাঁ? তোমাকে আমরা মাথায় করে রেখেছিলুম। তুমি না কেদার রায়ের বন্ধু বলে গর্ব কর? তবে এ ঘৃণিত প্রস্তাব কোন মুখে পাঠিয়েছিলে?

ঈশা খাঁ। ঘৃণিত কিসে?

কেদার। রূপ কি মানুষকে এমনি পাগল করে যে, সম্পর্ক বিচার করতে দেয় না? সংসারে রক্তের সম্বন্ধটাই সব? মানুষের গড়া সম্পর্কটা এমনি তুচ্ছ? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, বীর বলে না তোমার খুব অহঙ্কার ঈশা খাঁ? বীরের হৃদয় রূপ চেনে না, চেনে তরবারি।

ঈশা খাঁ। তুমিও তো বীর বলে বড় আস্ফালন কর, তবে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড কেমন করে করলে কেদার রায়? কেন হানলে নির্দোষের বুকে এ মৃত্যুশেল?

কেদার। তুমিই শিখিয়েছ ঈশা খাঁ, যে, সংসারে দয়া-মায়া বন্ধুত্বের কোন স্থান নেই। শিখিয়েছ যে, যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে আপামর সাধারণকে স্নেহের বন্ধনে বেঁধে রাখতে চায়, তাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়।

ঈশা খাঁ। একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছি, তাতেই তোমাদের এত অপমান কেদার রায়?

কেদার। হ্যাঁ—এত অপমান। তুমি তা বুঝতে পারবে না ঈশা খাঁ! বুঝতে পারতো, যদি বেঁচে থাকতো তোমার পিতা কালিদাস গজদানী। তুমি আমাদের বিশ্বাসের মূলে যে কুঠারাঘাত করেছ, তার শাস্তি এখনও হয়নি ঈশা খাঁ! এখনও তোমার সোনারগাঁর দুর্গে তোমার বিজয়-নিশান পৎ-পৎ করে উড়ছে; আমি সে নিশান টেনে ছিঁড়ে ফেলে তার স্থানে চাঁদ রায়ের জয়-পতাকা উড়িয়ে দেবো।

ঈশা খাঁ। তার পূর্বেই যে তুমি মরবে কেদার রায়!

কেদার। বেশ, এসো—আমি তোমারই অপেক্ষা করছি—

[ উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

[ নেপথ্যে কোলাহল—"আগুন—আগুন—আগুন!" ]

এনায়তের প্রবেশ।

এনায়েত। পুড়ে মর, পুড়ে মর ওরে দর্পী! যেমন করে কলাগাছিয়া দুর্গের নিরীহ অধিবাসীরা প্রাণ দিয়েছে, তোরা তেমনি করে মর, আমি আনন্দে নৃত্য করি।

নেপথ্যে পুনরায় কোলাহল—"আগুন—আগুন—আগুন!" ]

ঈশা খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

ঈশা খাঁ। এনায়েত—এনায়েত! ছিঃ-ছিঃ, করলে কি কাপুরুষ?

এনায়েত। কেন? ওরা আমাদের কলাগাছিয়া দুর্গ ঠিক এমনি করে পোড়ায়নি?

ঈশা খাঁ। মূর্খ! এ যে আমার দুর্গ—আমার বক্ষপঞ্জর!

এনায়েত। কিন্তু চাঁদ রায়ের অধিকারে।

ঈশা খাঁ। তা হলেও এ আমার। নির্বাণ কর, অগ্নি নির্বাণ কর। কাঞ্চন বালক, কিন্তু তুমি তো বালক নও এনায়েত!

এনায়েত। কেন দুঃখিত হচ্ছো বন্ধু? শঠের সঙ্গে এই শাঠ্যই ধর্ম।

[ প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। ওরে আকাশে এত মেঘ, একটু বৃষ্টিপাত হয় না? খোদা! আকাশ ভেঙ্গে ফেল, মুষলধারে বর্ষণ কর—বর্ষণ কর! দুর্গ-বাসিগণ! জাগো—জাগো—জাগো— [ প্রস্থান।

নেপথ্যে কেদার। জাগো—জাগো হিন্দুগণ! দাদা—দাদা—

চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের প্রবেশ।

চাঁদ। কেন আমায় জাগিয়ে দিলে কেদার? মরবার এই তো সুযোগ! এমন দুঃখদীর্ণ জীবন আমার—ওরে, কাঞ্চন কই? কাঞ্চন।

কেদার। বোধ হয় নিদ্রিত।

চাঁদ। জাগাতে পারলিনে? আমার প্রাণটাই কি এত মূল্যবান? [ প্রস্থানোদ্যত ]

কেদার। কোথায় যাচ্ছ দাদা? মরবে যে!

চাঁদ। সরে যা—কাঞ্চনকে নিয়ে আসি—

কেদার। না—যেতে পাবে না।

চাঁদ। সর—সর কেদার! আমায় পাগল করিসনি। ওরে, এ কি নিষ্ঠুর প্রাণ! ~~কেদার—কেদার—ওঃ, এমন পাষাণ [illegible]~~? সে তোর ছেলে না? তুই তাকে এমনি করে মেরে ফেলবি?

কেদার। সবাই যদি মরতে পারে, সে কেন মরবে না দাদা?

চাঁদ। তবে আমাকে জাগালি কেন? সবার সঙ্গে আমি কি মরতে পারতুম না?

কেদার। দাদা! একটা কাঞ্চন গেলে সহস্র কাঞ্চন জন্মাবে, কিন্তু এক চাঁদ গেলে বাংলায় আর চাঁদ উঠবে না।

চাঁদ। দূর হ—দূর হ নিষ্ঠুর! বাজ পড়ুক তোর মাথায়—

[ প্রস্থান।

কেদার। বাঃ-বাঃ-বাঃ! আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এলো। আয়—আয়—আয়, শ্রাবণের ধারায় নেমে আয়। কোটিশ্বর! কোটিশ্বর! তোমার এত দয়া! কিন্তু এনায়েত খাঁ, তোমাকে আমি যদি বন্দী করতে না পারি, তবে বৃথাই আমার নাম কেদার রায়।

[ প্রস্থান।

অর্ধমূর্ছিত কাঞ্চনকে লইয়া চাঁদ রায়ের প্রবেশ।

চাঁদ। কাঞ্চন—কাঞ্চন—

কাঞ্চন। [ তন্দ্রাচ্ছন্নের মত ] রাত্রি কি ভোর হয়েছে?

চাঁদ। হ্যাঁ বাবা, ভোর হয়েছে।

কাঞ্চন। এ্যাঁ—ভোর হয়েছে! জ্যাঠামশায়! জ্যাঠামশায়! আমায় তুলে ধর—

চাঁদ। [ ধীরে ধীরে কাঞ্চনকে উঠাইয়া বক্ষের কাছে টানিয়া লইলেন, পরে বলিলেন ] কোথায় লেগেছে বাবা ?

কাঞ্চন। কি জানি, বলতে পারছি না। জ্যাঠামশায়! আমার পা দুটো টলছে। আমায় একটা লাঠির ঘা দিয়ে চাঙ্গা করে তুলতে পার ?

চাঁদ। ভয় কি বাবা? তুমি আমার কাছে রয়েছ।

কাঞ্চন। সে জন্য নয়। জ্যাঠামশায়! আজ আমার জন্মতিথি, আমাকে আজ শ্রীপুরে যেতেই হবে।

চাঁদ। আজ? অমন কল্পনা মনে স্থান দিসনে বালক! আমি যেতে দেবো না।

কাঞ্চন। দিতে হবে মহারাজ! আমি মার পা ছুঁয়ে শপথ করে এসেছি—যেখানেই থাকি, আজ নিশ্চয়ই তাঁর পায়ের ধূলো নেবো। আঃ, কি মধুর বৃষ্টি! জ্যাঠামশায়! আমি সুস্থ হয়েছি, আমায় যেতে দাও—

চাঁদ। না—না—কিছুতেই না।

কাঞ্চন। আমি যাবো—আমি যাবো; মায়ের প্রসাদ না পেলে আমি আজ জলগ্রহণ করবো না। জ্যাঠামশায়! পায়ে ধরি তোমার, আমায় যেতে দাও। মার কাছে আমি কখনও মিথ্যাবাদী হইনি। আমি না গেলে মা বড় কাঁদবে। আমাকে একা বিশ্বাস না হয়, কেশরীকাকাকে সঙ্গে দাও—

চাঁদ। না।

কাঞ্চন। তোমার মরা মায়ের দোহাই, আমায় আটকে রেখো না। এখন তো আমি সুস্থ হয়েছি! আরও ভেবে দেখ, আমার মাথাটার উপর সবার দৃষ্টি। ঈশা খাঁ আমাকে দেখতে পেলে—

চাঁদ। ঠিক—ঠিক বলেছ। যাও, চলে যাও; দ্রুতগামী বজরা দিচ্ছি, তীরের মত ছুটে যাও। এসো—এসো—

[ উভয়ের প্রস্থান।

[ নেপথ্যে "আল্লা—আল্লা—আল্লা-হো" ধ্বনি ও কামানগর্জন ]

নেপথ্যে। জয় কোটিশ্বর!

[ ঘন ঘন কামান গর্জন ]

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

শ্রীপুর-রাজপ্রাসাদ

স্বর্ণময়ীর কক্ষের সম্মুখস্থ দরদালান

গীতকণ্ঠে নর্তকীগণের প্রবেশ।

নর্তকীগণ।—

### গীত

এমন নিঝুম রাতে
এমন চাঁদিমাচালা টিক্কুকুব মোর,
তবু ঘুম নাই আঁখিপাতে।
যার তরে পরিয়াছি আজি এ মোহন বেশ,
ফিরিয়ে তো চাহিল না আমার সে হৃদয়েশ,
বৃথা ঘরে দীপ জ্বালা, গাঁথা কুসুমের মালা,
আঁকিয়াছি আলপনা বৃথা আঙিনাতে।

ভবানীর প্রবেশ

ভবানী। বন্ধ কর তোদের নাচ-গান। যা—[ নর্তকীগণের প্রস্থান। ] যার জন্মতিথি, যার জন্য এত উৎসব, এখনও তার দেখা নেই। সন্ধ্যা হয়ে এলো, আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে; আজ আর আসবে না। কি হলো কে জানে! মন বড় কু গাইছে। সে যে বলে গেল, আজ সে আসবেই! আমার কাছে সে মিথ্যাবাদী হবে? কাঞ্চন—কাঞ্চন! এলিনে নিষ্ঠুর!

কেশার মার প্রবেশ।

কেশার মা। হ্যাঁ গা বৌমা, তুমি যে কিছু বলছো না?

ভবানী। কি মা? তোমার চোখে জল কেন? তুমি কি কোন দুঃসংবাদ এনেছ? বল—বল, আমার মন বড ব্যাকুল হয়েছে! মা' কাঞ্চন এখনও এলো না—

কেশার মা। সেই দুঃখে তুমি হা-হুতাশ করতে থাক, আর মেয়েটা এদিকে না খেয়ে মরে যাক!

ভবানী। কার কথা বলছো মা?

কেশার মা। আ—আমার পোড়া কপাল! তোমার হুঁশই নেই; সোনা যে আজ সারাদিন না খেয়েই পড়ে আছে।

ভবানী। কেন?

কেশার মা। একাদশী গো—একাদশী।

ভবানী। তার আবার একাদশী কি? কই, আমাকে তো এ কথা কেউ বলেনি?

কেশার মা। বলিনি? দশবার বলেছি! তোমার কি মাথায়

ঠিক আছে? কাঞ্চন—কাঞ্চন করেই তুমি পাগল! কাঞ্চন তোমার স্বর্গে বাতি দেবে।

ভবানী। এই মেয়েটাই যত অনর্থের মূল! সোনা—সোনা!

নেপথ্যে স্বর্ণময়ী। কেন?

কেশার মা। দোর খোল নচ্ছার মেয়ে কোথাকার! হাড়-মাস জ্বালিয়ে খেলে!

**সজলনয়নে স্বর্ণময়ীর প্রবেশ।**

কেশার মা। দেখেছ বৌমা—দেখেছ, মুখখানা শুকিয়ে কালি হয়ে গেছে! [ রাগিয়া ] তুমি যে কিছু বলছো না বাছা? মেয়েটা এমনি দাঁত ছিরকুটে মরুক তবে?

ভবানী। সোনা। আজ কাঞ্চনের জন্মতিথি; সারাদিন এই উৎসব গেল, তার মাঝে তুই উপবাসী রয়ে গেলি? ক্ষিধের জ্বালায় তোর প্রাণটা ছটফট করবে—তৃষ্ণায় তোর বুকটা শুকিয়ে যাবে, আর আমরা দু'হাত পুরে খাবো? কাঞ্চন এলো না—ভাবনায় সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসছে, তুই আর আমার জ্বালাসনি সোনা!

স্বর্ণময়ী। আজ যে একাদশী মা!

কেশার মা। আমি আগে মরি, তারপর তুই একাদশী করিস।

স্বর্ণময়ী। [ স্বগত ] ভগবান! কত স্নেহ ঢেলে দিয়েছ ধাত্রীর বুকে। [ প্রকাশ্যে ] কেশার মা! আর আমায় অনুরোধ করিসনে, আমি কিছুতেই রাখতে পারবো না।

ভবানী। একে একে সবাইকে পাগল করেছিস, আমায় আর পাগল করিসনি।

স্বর্ণময়ী। মা! আমার শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দাও, তোমার দুটি

পায়ে পড়ি, আর আমায় এখানে বেঁধে রেখো না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, বয়স্থা মেয়ে বাপের বাড়িতে থাকলেই তার চারিদিকে লোকের কুৎসার জঞ্জাল জমে ওঠে, তার ওপর সহস্র পশুর লুব্ধ দৃষ্টি ছুটে আসে। আমার জন্য দেশে অশান্তি, তোমাদের চোখে ঘুম নেই, আমার জন্য আত্মীয়-স্বজন বিপন্ন; আর আমি তোমাদের বিপন্ন করবো না। মা! তোমাদের সব অশান্তির কণ্ঠরোধ করে আমি আমার নিজের ঘরে চলে যাই। সেখানে আমার এই দগ্ধ ললাট আমরণ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে লুকিয়ে রাখবো, শত ঈশা খাঁ সহস্র বৎসর চেষ্টা করলেও আমার মুখ দেখতে পাবে না।

কেশার মা। দিদি—দিদি!

স্বর্ণময়ী। আমার মুখটা পুড়িয়ে দিতে পারিস? এ মুখ যে কাউকে দেখাতে লজ্জা হচ্ছে কেশার মা! একটা বিধর্মী—ছিঃ ছিঃ-ছিঃ! যত ভাবি, ততই আমার মরতে ইচ্ছা হয়!

ভবানী। সোনা!

স্বর্ণময়ী। মা! আমায় শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দাও—[ ভবানীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল ]

কেশার মা। আমায় আগে মরতে দে। ওরে, আমি আগে মরি, তারপর তুই যেখানে ইচ্ছা চলে যাস। [ হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ]

ভবানী। কোটিশ্বর! তুমি এত নিষ্ঠুর? তোমার পায়ে একদিনও ফুল-জল দিইনি? একদিনও কি চোখের জলে তোমার পা ধুইয়ে দিইনি পাষাণ? তবে আমার এ ননীর পুতুলের মাথায় এমন বাজ হানলে কেন?

[ তিনটি নারীর অবিরল অশ্রুধারে হর্ম্যতল সিক্ত হইল ]

গীতকণ্ঠে চম্পাকের প্রবেশ

চম্পক।—

## গীত

আমার দুঃখ তাহে নই।
তুমি বাজ হেনেছ আমার বুক,
আমি সইতে যেন পাই।
যদি পরাণ আমার টলে,
জ্বালিও আমায় জ্বালিও প্রিয় অশেষ দুঃখানলে
দিও আমায় শক্তি দিও, বইতে তোমার উত্তরীয়,
নামটি তোমার নিয়ে বুকে হবো শ্মশানচিতায় ছাই।

স্বর্ণময়ী। [ বাহু বাড়াইয়া চম্পককে কোলে তুলিয়া লইলেন ] ভগবান! মরুভূমির মধ্যে এ কি শীতল প্রস্রবণ!

ভবানী। দেখছো মা, দেখছো? এ কি সর্বনেশে রূপ! আমি এ রূপ কোথায় লুকিয়ে রাখি বল?

কেশার মা। মর আবাগীর বেটি, কথার ছিরি দেখ!

স্বর্ণময়ী। আমি শ্বশুরবাড়ি গেলে কার কোলে উঠবি চম্পক?

চম্পক। আমি যেতে দেবো না।

স্বর্ণময়ী। যদি মরে যাই?

চম্পক। যাঃ, বলতে নেই।

স্বর্ণময়ী। তোর জন্যই আমার যত ভাবনা।

দেবলের প্রবেশ।

দেবল। রাণী-মা! দাদা এসেছিল?

ভবানী। কই না। কেন ঠাকুর?

দেবল। বলতে পারবো না, আমার মুখে কথা আটকে আসছে। তাই তো, আমি কি করি? রাণী-মা! না—না, আমি যাই—আমি যাই—

ভবানী। ঠাকুর! আপনার সর্বাঙ্গ কাঁপছে কেন? কি হয়েছে ঠাকুর? আমার প্রাণ বড় কাঁদছে; বলুন—বলুন, আপনি কি দুঃসংবাদ এনেছেন?

দেবল। আমার মুখ চেপে ধরেছে—দাদা বারণ করেছে, আমি বলতে পারবো না—

কেশার মা। গাঁজাখোর মিনসে! তবে বারবার জ্বালাতে আসিস কেন?

স্বর্ণময়ী। ঠাকুর! আপনি শিশুর মত সরল, আপনি তো ছলনা জানেন না! কি বলতে এসেছেন, বলুন—

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। আমি বলছি শোন।

দেবল। ওঃ—[ আর্তনাদ করিয়া উঠিল ]

শ্রীমন্ত। দেবল!

দেবল। বলো না দাদা—বলো না—[ পদধারণ ]

শ্রীমন্ত। দূর হও মূর্খ!

[ নিতান্ত অনিচ্ছায় দেবলের প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। গুরুদেব! [ প্রণাম ]

শ্রীমন্ত। [ কয়েক পদ পিছাইয়া ] স্পর্শ করো না—আমার অশৌচ।

ভবানী। ঠাকুর! ভয়ে আমার কথা আসছে না। আজ এক

মাস আমরা আপনার পদধূলি পাইনি। এই রাত্রে দুর্যোগ মাথায় করে আপনি যখন এসেছেন, নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ আছে।

শ্রীমন্ত। [ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ] হ্যাঁ—দুঃসংবাদ আছে।

স্বর্ণময়ী। চুপ করে রইলেন যে? আপনি কোথা থেকে আসছেন?

শ্রীমন্ত। স্বর্ণদ্বীপ থেকে।

স্বর্ণময়ী। বাবা, কাকা এঁরা সব ভাল আছেন? দাদা কেন এলো না?

ভবানী। যুদ্ধের সংবাদ কি ঠাকুর?

শ্রীমন্ত। সংবাদ অশুভ; চাঁদ কেদার বন্দী।

ভবানী, স্বর্ণময়ী ও চম্পক। বন্দী?

স্বর্ণময়ী। আমার জন্য—আমার জন্য তাঁরা বন্দী? ঠাকুর—ঠাকুর! সংসার যা কখনও কল্পনা করতে পারেনি, আমার অদৃষ্টে তাই সম্ভব হলো? চাঁদ রায়, কেদার রায় বন্দী? আর সে আমার জন্য? কোথায় মুখ লুকাবো? চম্পক! চম্পক! একটু বিষ আনতে পারিস? না হয় আমার গলাটা টিপে ধর! ওরে আমার জন্য বাংলার সিংহ আজ পিঞ্জরাবদ্ধ! ওঃ—

ভবানী। মা! কি করি মা?

কেশার মা। [ এতক্ষণ শ্রীমন্তের আপদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিল; এইবার তাহার সম্মুখে আগাইয়া আসিল ] নষ্টামি করতে এয়েছ? চাঁদ কেদার কখনও বন্দী হয়? বাংলাদেশে এমন মরদের বাচ্চা আছে যে, তাদের বাঁধে?

ভবানী। আজ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে মা! বুঝতে পারছি, দেবল ঠাকুরও সেই কথাই বলতে এসেছিল। সে তো প্রাণ গেলেও মিথ্যা কথা বলবে না।

কেশার মা। তা বটে! বৌমা! আমি একবার যাবো? দেখে আসি, কোন মার দুধ খেয়েছিল তারা, যারা আমার চাঁদ কেদারকে বেঁধে রাখে!

চম্পক। গুরুদেব! আমার দাদা কেমন আছে?

ভবানী। কথা বলছেন না যে? ঠাকুর! আমি ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারছি না। বলুন, আমার কাঞ্চন কেমন আছে?

শ্রীমন্ত। কাঞ্চন নেই—

সকলে। নেই—

স্বর্ণময়ী। গুরুদেব—

চম্পক। দাদা নেই?

কেশার মা। বৌমা—বৌমা! ও কি মা? অমন করছো কেন মা?

[ ভবানীকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন, মূর্ছিত দেহ শ্রীমন্তের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল ]

চম্পক। মা! ও মা! মা গো—[ ভবানীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল ]

কেশার মা। দেখ—দেখ, মরেছে না কি দেখ! যদি না মরে থাকে, গলা টিপে মার! এত দুঃখ কি সইতে পারে? ঠাকুর! সুখের সময় আসতে পার না, দুঃখের খবরটা তো খুব নিয়ে আসতে পার! বল, আর কি বলবার আছে? কেশা মরেনি?

শ্রীমন্ত। না।

কেশার মা। ওঃ-ভারী আমার সুখের খবরটা দিলেন! কাঞ্চন মলো, চাঁদ কেদারকে বেঁধে নিয়ে গেল সে অভাগা বেঁচে থাকতে? তারপর আর কিছু বলবার আছে?

শ্রীমন্ত। ঈশা খাঁ সসৈন্যে শ্রীপুরে আসছে। কাল প্রভাতেই

শ্রীপুরে তার কামানের গোলা গর্জ্জে উঠবে। রাজ্যটাকে শ্মশান করে সে সগৌরবে ফিরে যাবে, সঙ্গে নিয়ে যাবে—

স্বর্ণময়ী। কি গুরুদেব?

শ্রীমন্ত। বলতে পারছি না স্বর্ণ! চাঁদ কেদার বন্দী, কাঞ্চন পরলোকে, সৈন্যগণ কেউ বেঁচে নেই। দুর্বল আমরা, আমাদের চোখের উপর ঈশা খাঁ শ্রীপুর ধ্বংস করে বিজয়লক্ষ্মীর মত সঙ্গে নিয়ে যাবে তোমাকে!

স্বর্ণময়ী। [ কানে হাত দিল ]

কেশার মা। ভয় কি দিদি? আমি বেঁচে থাকতে কেউ তোর গায়ে কাঁটার আঁচড় দিতেও পারবে না। ঈশা খাঁর মত সাতশো মরদকে আমি লাঠির ঘায়ে ঠাণ্ডা করে দেবো।

স্বর্ণময়ী। গুরুদেব! বাবা একথা শুনেছেন?

শ্রীমন্ত। শুনেছেন বৈকি মা! তাই যাবার সময় আমাকে চুপি-চুপি বলে গেছেন "ঠাকুর! আমরা তো বন্দী, সোনাকে রক্ষা করতে কেউ নেই, তাকে চন্দ্রদ্বীপে পাঠিয়ে দাও, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করো না!" আমি এখন কি করি? তারা যে এসে পড়লো বলে!

কেশার মা। আসুক, আর কেউ না থাকে, আমি আছি। আগে ওদের হটিয়ে দিই, তারপর দেখবো, চাঁদ কেদারকে কে বেধে রাখে?

স্বর্ণময়ী। না-না-না, তুই পারবি না। এমন দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি যে আমার স্পর্শে সবাই জ্বলে যাবে। বাবা কাকা বন্দী হয়েছেন, দাদা প্রাণ দিয়েছেন, তোদের আর বিপন্ন করবো না। এখনও আমার পিতৃকুলে একটি ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলছে; আমি এখানে থাকলে, এও নিভে যাবে! মা—মা—মা গো! ওমা, ওঠ মা—

ভবানী। [ মূর্চ্ছাভঙ্গে ] কেন ডাকলি সোনা? আমায় মরতেও

দিবিনে? কাঞ্চন! কাঞ্চন! আমার কাঞ্চন! তাই তুমি আসতে পারনি বাবা? আমি যে তোর উপর বড় অভিমান করেছিলুম!

স্বর্ণময়ী। তুমি যদি এত আকুল হও, তা হলে আমি কি করবো মা! যাবার সময় আমি তার সঙ্গে একটা কথাও বলিনি। দাদা—দাদা—

শ্রীমন্ত। কাঁদবার সময় অনেক পাবে মা! এখন রায়বংশের সুনাম রক্ষা কর। ঈশা খাঁ রাত্রি ভোরেই সসৈন্যে শ্রীপুর আসবে—শ্রীপুর ধ্বংস করে সোনাকে নিয়ে চলে যাবে।

ভবানী। সোনাকে নিয়ে চলে যাবে? ওঃ—ঠাকুর! কেউ নেই আর; কে রক্ষা করবে এই অভাগিনীকে? ঠাকুর! আমার ছেলে গেল, স্বামী দেবর কারাগারে, আমার বংশের সুনাম—তাও যাবে? কোটিশ্বর! তুমি এমন নিষ্ঠুর?

কেশার মা। কেন ভয় পাচ্ছো মা? আমি তো আছি, দেখি না কার কত ক্ষ্যামতা!

ভবানী। অমন দুটো সিংহ ব্যাঘ্র যেখানে বন্দী, তুমি সেখানে কি করবে মা? গুরুদেব! উপায় করুন—

শ্রীমন্ত। উপায় তো মা, চাঁদ নিজেই করে দিয়েছেন। সোনাকে আমার সঙ্গে চন্দ্রদ্বীপে পাঠিয়ে দাও—এই তাঁর আদেশ। আমি বজরা ঘাটে রেখে এসেছি। যদি পাঠাতে হয়, এখনি।

ভবানী। এখনি? এই রাত্রি—এই দুর্যোগ, তার উপর—ঠাকুর! সোনার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখুন! সারাদিন উপবাসে মুখখানা কালি হয়ে গিয়েছে। আমি যে মা, এমন কাঙালের মত ওকে আমি কেমন করে বিদায় দেবো?

স্বর্ণময়ী। আমার তাতে কোন কষ্ট হবে না মা, কেন কাঁদছো?

আবার আসবো, আবার তোমার পায়ের ধুলো নেবো। বাবা আর কাকা যদি আসেন, আমায় নিয়ে এসো। কেশার মা! দাদার দেহটা এই শ্রীপুরে এনে সৎকার করিস। মা! দাদার চিতার উপর একটা মন্দিব গড়ে তার গায়ে দাদার নামেব সঙ্গে আমার নামটা লিখে দিও।

ভবানী। সোনা! না—থাক, যেতে হবে না। তোকে রক্ষা করতে পারবো না জানি, কিন্তু সবাই মিলে একসঙ্গে মরতে তো পারবো?

কেশার মা। ঠিক বলেছ মা! যদি তাদের হটাতে না পারি, একসঙ্গে সবাই মরবো।

স্বর্ণময়ী। অবুঝ হয়ো না মা, তাতে কোন ফল হবে না, এত-বড একটা বংশের এই একটু স্মৃতিচিহ্ন, তাও থাকবে না। মা! মা! বল, আমি যাই? তোমাদেব ছেড়ে যেতে আমার কি কষ্ট হচ্ছে না? কি করবো, উপায় নেই।

শ্রীমন্ত। সোনা ঠিকই বলেছে মা! তুমি কেন কাতব হচ্ছো? আবার কত আসবে, কত যাবে!

ভবানী। ঠাকুব! মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যায়, মায়ের চোখে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আর আমার অদৃষ্ট দেখ! সাবাদিন উপবাসের পর এই জল ঝড়ের মধ্যে এমন দীন-দুঃখীব মত মেয়েটাকে কোথায় পাঠাচ্ছি!

কেশার মা। আমি বলছি বৌমা, ওকে পাঠিও না, হয়তো এ সবই মিথ্যে।

ভবানী। রাজার আদেশ। না মা, মেয়ে চিরকালই পর। যাক—একদিন তো যাবেই। গুরুদেব! অভাগিনী মেয়েটাকে আপনার হাতে সঁপে দিলুম; বুঝতে পারছি না, এতে ওর মঙ্গল কি অমঙ্গল! যাও মা, তোমার ঘরে তুমি যাও।

স্বর্ণময়ী। [ সাশ্রুনেত্রে ভবানীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল, পরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল ] মা! তবে যাই? কেশার মা! মুখ ফিরিয়ে রইলি কেন? আসি দিদি, একটা কথা ক'! ওরে, দাদা যাবার সময় আমিও এমনি মুখ ফিরিয়েছিলুম; সেকথা মনে করে আজ আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!

কেশার মা। দিদি! তুই যাসনে, ওরে যাসনে! কি জানি কেন মনে হচ্ছে, আর তোকে দেখতে পাবো না।

শ্রীমন্ত। ও কি কথা কেশার মা? ছিঃ! এসো মা স্বর্ণ, আর দেরী করো না।

স্বর্ণময়ী। [ নিদ্রিত চম্পকের কাছে গিয়া ] ঘুমিয়ে পড়েছে। কোটিশ্বর! আমার ভাইটিকে তুমি দেখো। চম্পক—চম্পক! না—না, উঠলে আর যেতে পারবো না। থাক—[ কাঁদিতে কাঁদিতে লুণ্ঠিত অঞ্চলে প্রস্থানোদ্যতা হইলেন ]

চম্পক। [ সহসা ] দিদি—

স্বর্ণময়ী। [ ফিরিয়া ] ভাই! আমি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি, তোর বিয়ের সময় আবার আসবো—

[ স্বর্ণময়ী প্রস্থানোদ্যতা হইলে চম্পক তাহার লুণ্ঠিত অঞ্চল চাপিয়া ধরিল; স্বর্ণ অঞ্চল ছাড়াইতে বহু চেষ্টা করিল, চম্পকের দুই গণ্ডে অজস্র চুম্বন করিল, তারপর এক রকম জোর করিয়া চলিয়া গেল। চম্পক আছড়াইয়া পড়িল, কেশার মা তাহাকে কোলে করিয়া চলিয়া গেল; ভবানী পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন ]

নেপথ্যে শ্রীমন্ত। খোকা—খোকা! হাঃ হাঃ-হাঃ—

ভবানী। [ চমকিয়া ] কাঞ্চন—কাঞ্চন!

ঝড়ের বেগে কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। মা—মা—মা! আমি এসেছি মা!

ভবানী। স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন নয়; এই তো আমার যশোদার গোপাল!

কাঞ্চন। মা! আমাদের জয় হয়েছে।

ভবানী। তবে তাঁরা বন্দী নন?

কাঞ্চন। না, আমাদের কেউ বন্দী নয় তো মা!

ভবানী। প্রতারণায় ভুলেছি। কাঞ্চন! ওরে, গুরু শ্রীমন্ত এসে সোনাকে নিয়ে গেছে।

কাঞ্চন। কোথায়?

ভবানী। চন্দ্রদ্বীপে। বললে, মহারাজের আদেশ।

কাঞ্চন। তবে আবার আমায় ছুটতে হলো—[ প্রস্থানোদ্যত ]

ভবানী। কাঞ্চন—

কাঞ্চন। [ ফিরিয়া আসিয়া ভবানীকে প্রণাম করিল ] মা! যদি সোনাকে নিয়ে ফিরতে পারি, তবেই ফিরবো, নইলে এই যাত্রাই আমার শেষ যাত্রা।

[ দ্রুত প্রস্থান।

ভবানী। কোটিশ্বর! ছিনিয়ে নিলে? সব ছিনিয়ে নিলে?

[ প্রস্থান।

---

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

স্বর্ণদ্বীপ—দুর্গাভ্যন্তর

কাল—রাত্রি

কেদার রায় পদচারণা করিতেছিলেন।

কেদার। স্বর্ণদ্বীপ চাঁদ রায়ের অধিকারে, এনায়েত খাঁ বন্দী, স্বর্ণদ্বীপের প্রজাগণ আর স্বপ্নেও চাঁদের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে সাহস করবে না। সব বুঝতে পারি, কিন্তু ঈশা খাঁর এই আকস্মিক অন্তর্ধান কিছুতেই বুঝতে পারছি না। বন্ধু এনায়েত খাঁকে বন্দী অবস্থায় ফেলে ঈশা খাঁ পালিয়ে যাবে, এতবড় কাপুরুষ তো সে নয়। তাই তো—

চাঁদ রায়ের প্রবেশ।

চাঁদ। কেদার—কেদার—

কেদার। কি দাদা! এমন অসময়ে জেগে উঠলে যে?

চাঁদ। কে আমায় ডাকলে কেদার?

কেদার। সে কি! কই না, আমি তো কারও কোন সাড়া-শব্দ পাইনি দাদা!

চাঁদ। পাওনি? তা হবে। কিন্তু—না কেদার, একবার নয়, বহুবার কাতরকণ্ঠে কে আমায় 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাকলে! আমি স্পষ্ট শুনেছি, এ মিথ্যা হতে পারে না; এ সোনার কণ্ঠস্বর।

কেদার। দাদা! ছিঃ-ছিঃ! এইমাত্র যে দুহাতে নরমুণ্ড গণনা করে এসেছে, বারুদের স্তূপের উপর যাকে অষ্টপ্রহর বসে থাকতে হয়, তার এ নারীসুলভ দুর্বলতা সাজে না।

চাঁদ। না কেদার! এ স্বপ্ন নয়, তুমি অনুসন্ধান কর।

কেদার। কি আর অনুসন্ধান করবো দাদা? তোমাকে নিদ্রিত রেখে আমি এখানে সহস্র চক্ষু মেলে বসে আছি। যাও দাদা, বিশ্রাম করগে, আমি থাকতে তুমি কেন জেগে থাকবে? আমি বলছি, কেউ তোমাকে ডাকেনি, কারও অমঙ্গল হয়নি।

চাঁদ। না হলেই ভাল, কিন্তু মনের যে একটা কান আছে কেদার! সে দূরত্ব মানে না, শত যোজন দূরের ডাক সে স্পষ্ট শুনতে পায়। কেদার! তুই এখানে বসে স্বর্ণদ্বীপে পাহারা দে, আমি একবার শ্রীপুরে গিয়ে দেখে আসি, কেমন আছে আমার অভাগিনী সোনা। আসবার সময় মেয়েটা কাছে এলো না, পাছে শুভকাজে বিঘ্ন হয়। মনটা বড় কাঁদছে কেদার!

কেদার। না দাদা, তোমার এখন যাওয়া হবে না। একটা রাজ্য অধিকার করেছ, এর সুশাসনের ব্যবস্থা করতে হবে না?

চাঁদ। যা হয় তুমি কর, আমি রাজ্য চাই না।

কেদার। তুমি রাজ্য না চাইলেও, রাজ্য তোমাকে চায়।

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। মহারাজ—[ চাঁদ রায়ের পদতলে পতন ]

চাঁদ। কি রক্ষী?

রক্ষী। [ সভয়ে ] ব—ন্দী কারাগারে নেই।

কেদার। এঁ্যা—নেই? কোন বন্দী? এনায়েত খাঁ? পালিয়েছে?

আর তুমি মহানন্দে নিদ্রা দিচ্ছিলে, কেমন? ওঃ—এই এনায়েত খাঁকে বন্দী করতে আমি কত সৈন্য হারিয়েছি। দাদা! কি করা যায়?

চাঁদ। সন্ধান কর রক্ষী, এখনও সে বহুদূর যায়নি।

কেদার। কাল সূর্যাস্তের পূর্বে যদি তার সন্ধান না পাই, তা হলে কেদার রায়কে তুমি জান—[ তরবারিতে হাত দিলেন ]

[ রক্ষীর সভয়ে প্রস্থান।

কেদার। এনায়েত খাঁ! না—তোমাকে বন্দী করাই আমাব ভুল হয়েছিল। এবার যদি তোমাকে পাই, হত্যা—হত্যা—নির্মম হত্যা!

[ প্রস্থান।

চাঁদ। তাই তো, কেন মনটা এমন কেঁদে উঠছে? কি যেন একটা পরম সম্পদ হারিয়ে গেছে। কাঞ্চন সেই যে গেছে, আজও কোন সংবাদ নেই! না জানি, কেমন আছে আমার অভাগিনী সোনা।

গীতকণ্ঠে সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন।—

**গীত**

হায়, পশেছে কীট কুন্দফুলে।
সোনা যে তোর নাইরে সোনা বিকিয়ে গেছে কাচের মূলে।

চাঁদ। কি বলছো তুমি উন্মাদ?

সনাতন।— **পূর্ব গীতাংশ**

বলি যাহা কান পেতে শোন, পুত্র কন্যা মিছে ভাই বোন,
চিন্তামণির চিন্তা কর মিছে মায়ার কাঁদন ভুলে।

চাঁদ। পুত্র কন্যা ভাই বোন মিথ্যা? হোক; এই মিথ্যাকে আশ্রয় করে এতখানি জীবনের পথ চলে এসেছি, এই মিথ্যাকে নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই।

সনাতন ।—

## পূর্ব গীতাংশ

তেমন বাঁচা নয় রে বাঁচা, ভাঙবে যেদিন সোনার খাঁচা,
পারবিনে তার পদ-তরী, কাঁদবি বসে নদীর কূলে ॥

[ প্রস্থান ।

চাঁদ । ভগবান ! ভগবান ! তোমারই দান পুত্র-কন্যা ; তোমারই দান ভাই-বোন ! তোমার সাজানো এই সংসার পায়ে ঠেলে চলে যাবো, এ কখনও তোমার বিধান হতে পারে না । আমি এদের নিয়ে উঠেছি, এদের নিয়েই চলবো । পাপ যদি হয়, সে পাপ তোমার—আমার নয় ।

### বালকবেশে আলেয়ার প্রবেশ ।

আলেয়া । মহারাজ চাঁদ রায় !

চাঁদ । কে তুমি বালক, এই নিশীথ রাত্রে আমার দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করেছ ?

আলেয়া । তোমার দুর্গ ? মহারাজ ! দু' দিন পূর্বে এ দুর্গ আমাদের ছিল, অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, আজ নিজের ঘরে আমায় চোরের মত প্রবেশ করতে হয় ।

চাঁদ । কে তুমি বালক ? ঈশা খাঁ কি তোমার কেউ হয় ?

আলেয়া । আমার ভাই ।

চাঁদ । ভাই ? ওঃ—নিশীথ রাত্রে অতর্কিতে প্রতিশোধ নিতে এসেছ ?

আলেয়া । না মহারাজ, মানুষের গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে আমি জানি না । আমি স্বীকার করছি, আপনি ঈশা খাঁর যে ক্ষতিসাধন

করেছেন, এ তার প্রাপ্য ; কিন্তু মহারাজ ! যত কিছু শক্রতার এই-খানেই অবসান হোক।

চাঁদ। শত্রুতার অবসান ? সে যদি আমার একটা বংশধরকেও হত্যা করতো, সে বিরোধ দু' কথায় মিটে যেতো। কিন্তু এ যে সহ্য করা যায় না বালক !

আলেয়া। মহারাজ ! আমার ভাই এক মুহূর্তের ভুলে যে অপরাধ করেছে, তার প্রতিদানে আপনি তাকে সর্বস্বান্ত করেছেন, তার সম্ভ্রম দু' পায়ে দলে আপনি তাকে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন ; তবু আমি বলছি, এর প্রতিবাদে সে একটা অঙ্গুলিহেলনও করবে না। আপনি শ্রীপুরে যান, ঈশা খাঁকে নিয়ে আমি আপনাদের সবার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো, ইচ্ছা হয় আপনি স্বহস্তে তার প্রাণবধ করবেন। তবু দোহাই মহারাজ ! বাংলার দুটো মহান জাতি হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ করে সোনার দেশটাকে রসাতলে দেবেন না।

চাঁদ। তুমি যা বলছো বালক, আমি একথা সহস্রবার ভেবেছি ; কিন্তু তা হবার নয়। চাঁদ রায় আর ঈশা খাঁ, এ দুজনের মধ্যে সন্ধি আর হতে পারে না ; পৃথিবীর আলো বাতাস হতে একজনকে বিচ্ছিন্ন হতেই হবে।

আলেয়া। কেন ? একটা বৃক্ষতলে দশজন ফকির বাস করতে পারে, আর এতবড় বাংলাদেশে দুজন বীরের স্থান হবে না ?

চাঁদ। না—হবে না।

আলেয়া। তা হলে আমি আর সোনারগাঁয়ে ফিরে যাবো না। সোনারগাঁ থেকে আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছি, বিমুখ হয়ে কিছুতেই ফিরবো না। এই আমি আপনার পায়ের তলায় বসেছি ; হয় সন্ধি করুন, না হয় আমাকে হত্যা করুন।

চাঁদ। বালক!

আলেয়া। কি বলে বোঝাবো মহারাজ? কত দুঃখ আমার বুকটার মধ্যে। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই আমার পরমাত্মীয়, আমার চোখের উপর তারা আত্মকলহে শক্তিক্ষয় করবে, এ যে অসহ্য!

চাঁদ। কে তুমি এই পঙ্কিল সংঘর্ষের মাঝখানে শক্তির দীপশিখা নিয়ে দাঁড়িয়েছ? এসো নবীন! এসো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অগ্রদূত! আমি তোমার আবেদন মাথায় করে নিলুম। ঈশা খাঁ যদি সন্ধির জন্য এগিয়ে আসে, আমি আবার তাকে বন্ধু বলে আলিঙ্গন করবো।

আলেয়া। মহারাজের জয় হোক! এইবার আমি বিচারপ্রার্থী রাজা!

চাঁদ। কিসের বিচার?

আলেয়া। বন্দীশালা হতে আমিই এনায়েত খাঁকে মুক্ত করেছি।

চাঁদ। তুমি! সেকি, কি করে?

আলেয়া। বলে নয় মহারাজ, ছলে।

চাঁদ। ওঃ—করেছ কি বালক? কেদার যদি একবার শোনে—

আলেয়া। আমি নিজেই তাঁকে বলতে যাচ্ছি।

চাঁদ। না-না-না, তুমি যাও—তুমি পালাও, এখনি—এই মুহূর্তে! জানি না, কেন তোমায় দেখে কেবলই আমার মেয়েটার কথা মনে হচ্ছে। এই কুসুমিত যৌবনে পৃথিবীর সুখভোগ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করতে চাই না। যাও—যাও—

আলেয়া। রাজা!

চাঁদ। আঃ—কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বহু সময় পাবে। যাও বালক, যাও; ভগবান তোমার সহায় হোন।

আলেয়া। সেলাম—সেলাম।

[ প্রস্থান।

চাঁদ। কেন এমন হয়? একই আকরে জন্ম এদের, তবু এক-জন দেবতা, আর একজন পশু।

কেদার রায়ের পুনঃ প্রবেশ।

কেদার। নাঃ—কোথাও বন্দীর চিহ্নমাত্র নেই।

চাঁদ। যেতে দাও—যেতে দাও। আমি বলি ঈশা খাঁর সঙ্গে সন্ধি করি এসো।

কেদার। সন্ধি? দাদা! তুমি কি বলছো?

চাঁদ। কেন কেদার? ঈশা খাঁ অপরাধী সত্য, কিন্তু আমরা তার উপর যে প্রতিশোধ নিয়েছি, বাংলাদেশ চিরদিন তা স্মরণ করবে। এর উপর সে যদি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে, আমরা কি তাকে ক্ষমা করতে পারি না?

কেদার। না—পারি না।

চাঁদ। তবে বৃথাই আমরা হিন্দু।

কেদার। দাদা! তুমি কি সেই চাঁদ রায়, যার ভয়ে একদিন গোটা বাংলাদেশ কেঁপে উঠতো? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, এত দুর্বল তোমায় কে করলে রাজা?

চাঁদ। কে করেছে? কানে সব শুনছো, চোখে সব দেখছো, তবু জিজ্ঞাসা করছো কেদার? ঘরে যার শিশুকন্যা এমনি করে ভোগের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে কি আর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে?

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। মহারাজ—

কেদার। কেশরী? শ্রীপুর থেকে আসছো?

চাঁদ। কেমন আছে সব? শ্রীপুরের কুশল তো?

কেশরী। মহারাজ—

চাঁদ। মাথা হেঁট করলে যে? কি হয়েছে বল? কাঞ্চন, চম্পক, সোনা, এরা সব ভাল আছে তো?

কেশরী। সোনা নিরুদ্দেশ।

চাঁদ। নিরুদ্দেশ?

কেদার। সে কি! কবে? কখন? কার সঙ্গে?

কেশরী। গুরু শ্রীমন্তের সঙ্গে।

কেদার। শ্রীমন্ত? ওঃ, দাদা—

চাঁদ। না—না, এ হতে পারে না; সপ্তপুরুষের কুলগুরুর বংশধর এমন নিষ্ঠুর হতে পারে না; এমন সরল সুন্দর দেবমূর্তি—কেশা! তুই বলছিস কি? তার মধ্যে এমন পিশাচ লুকিয়ে থাকবে? মিথ্যা—মিথ্যা, না হয় এ তোর ছলনা।

কেশরী। ছলনা কখনো শিখিনি মহারাজ! এ সত্য। কাঞ্চনের জন্মোৎসবের মধ্যে শ্রীমন্ত তাকে চন্দ্রদ্বীপের নাম করে ভুলিয়ে নিয়ে কোথায় চলে গেছে। মহারাণীকে বলেছে, কাঞ্চন যুদ্ধে নিহত—আপনারা বন্দী—মহারাজের আদেশ, তার সঙ্গে সোনাকে চন্দ্রদ্বীপে পাঠিয়ে দিতে।

চাঁদ। তারপর? চন্দ্রদ্বীপে সংবাদ নিয়েছ?

কেশরী। আমি চন্দ্রদ্বীপ থেকেই আসছি; সোনা সেখানে নেই।

কেদার। বুঝেছি—বুঝেছি, ঈশা খাঁর আকস্মিক অন্তর্ধানের কারণ এই। দাদা! সন্ধি করবে বলেছিলে না? কর সন্ধি, এমন সন্ধির সূত্র আর পাবে না। ওঃ—এই মেয়েটাকে আজ দশ বছর পক্ষিশাবকের মত পালকঢাকা দিয়ে রেখেছিলুম, যেন সংসারের কুটিল বাতাস তার গায়ে না লাগে; আজ এক দিনে শেষ—এক দিনে শেষ! না জানি

সে অভাগিনী আমাদের নাম ধরে কত ডাকছে, পাষণ্ড শ্রীমন্ত হয়তো তাকে কত নির্যাতন করছে! আজ সাতদিন, নাঃ—দুরাশা, সে সোনা আর সোনা নেই।

চাঁদ। এতবড় বংশ—পিতৃ-পিতামহের এই দেশজোড়া সুনাম—ওঃ, একটা মেয়ে হতে সব রসাতলে গেল! ঈশা খাঁর মাথাটা ছিঁড়ে আনতে পারি, তার সোনারগাঁ সমূলে উপড়ে ফেলতে পারি, কিন্তু এ হারানো মর্যাদা তো ফিরে পাবো না।

কেশরী। কাঞ্চন সোনারগাঁর দিকে গেছে; আমিও চললুম দাদা! যদি সোনাকে ফিরিয়ে আনতে পারি, তবেই ফিরবো; নইলে এই শেষ—

[ প্রস্থান।

কেদার। দাদা! চল যাই শ্রীপুরে; হয় তো শ্রীমন্ত তাকে শ্রীপুরেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আগে তার সন্ধান করি, তারপর ঈশা খাঁ আর শ্রীমন্তকে দেখবো।

চাঁদ। কি দেখবে? দেখার আর কি আছে কেদার? সাত সমুদ্র মন্থন করে যদি হারানিধি ফিরিয়ে নিয়ে এসো, তবুও এ নষ্ট গৌরব আর ফিরে পাবো না। ভয়ে সবাই নীরব থাকতে পারে, কিন্তু দেশসুদ্ধ লোকের মুখে যে ব্যঙ্গ-হাসি খেলবে, কি দিয়ে তা নিবারণ করবে কেদার?

কেদার। তরবারি দিয়ে—শ্রীমন্ত আর ঈশা খাঁর রক্ত দিয়ে। শৈশবে যখন মেয়েটার বিবাহ দিয়েছিলে, তখন তো এ কথা ভেবে দেখনি। যখন তার আবার বিবাহ দিতে সমাজের দোহাই দিয়েছিলে, তখন তো এ অঘটন কল্পনায় আননি! দোষ তোমার, এর জন্য সারা জীবন অনুতাপ করতে হবে। কাঁদবার অনেক সময় পাবে। এসো, অথর্ব পঙ্গুর মত হাহাকার না করে, শত্রুর বুকে বাঘের মত

লাফিয়ে পড়ি এসো। ঈশা খাঁর তাজা রক্ত চাই—শ্রীমন্তের ছিন্নমুণ্ড চাই—

[ প্রস্থান।

চাঁদ। কোটিশ্বর! দাঁড়িয়ে মজা দেখছো? বসো; যদি আমার বংশে একটু কলঙ্কের ছাপ পড়ে, তোমাকে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে আর পূজা করবো না, সিংহাসনসুদ্ধ তুলে এনে কালীগঙ্গায় বিসর্জন দেবো।

[ প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

নদীতীর

এনায়েত।

এনায়েত। কোনদিকে যাই? সোনারগাঁ—না শ্রীপুর? বন্ধু আমার শত্রুর কারাগারে আবদ্ধ দেখে অনায়াসে পালিয়ে গেল। আবার তারই দ্বারস্থ হবো? নাঃ—শ্রীপুরের দিকেই যাই। শ্রীপুরের অরক্ষিত প্রাসাদ ধূলিসাৎ করে কেদার রায়ের দর্প চূর্ণ করি, তারপর অন্য চিন্তা!

আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। কি খাঁ সাহেব, কার সর্বনাশের চিন্তা করছো?

এনায়েত। কে তুমি?

আলেয়া। চিনতেই পারলে না? বাঃ, স্মরণশক্তির তারিফ করতে হবে।

এনায়েত। ক্ষমা কর বালক! সেদিন অন্ধকারে তোমায় লক্ষ্য করিনি। তুমি আমায় কারাগার থেকে উদ্ধার করেছ; আমার জীবন তোমার কাছে বিক্রীত।

আলেয়া। মুখের কথা—না অন্তরের কথা?

এনায়েত। সত্য বালক! এ আমার অন্তরের কথা। আমার মনে হচ্ছে, তোমার দেওয়া জীবনটা তোমাকেই দান করতে পারলে আমি ধন্য হই। তুমি এমন সুন্দর। যদি তুমি নারী হতে, আমি তোমায় বিবাহ করতুম।

আলেয়া। তাই নাকি? এঁ্যা, আগে জানলে না হয় মেয়ে হয়েই জন্মাতুম। কি জানেন, আমারও আপনার উপর বেজায় টান পড়েছে।

এনায়েত। কিন্তু কেন? আমি তো তোমার কেউ নই, কখনও তোমার সঙ্গে পরিচয়ও ছিল না, তবে কিসের জন্য নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আমায় উদ্ধার করলে বালক?

আলেয়া। ওই যে বললুম, একটা বিষম টান পড়েছে।

এনায়েত। বালক! তোমাকে দেখে কেবলই আমার মনে হচ্ছে, এমনি একটি আপনার জন যদি আমার থাকতো—

আলেয়া। কেন, খাঁ সাহেবের কি আপনার জন কেউ নেই? বলি, বিবাহ করেছেন তো?

এনায়েত। বিবাহ? হাঁ্যা, তা করেছিলুম, কিন্তু সে একটা অতীতের স্বপ্ন! সে কথা আর তুলো না ভাই! অতীতের সে দুঃখময় ইতিহাস রাজপুতনার পথে ফেলে এসেছি।

আলেয়া। রাজপুতনা? আপনি তা হলে মুসলমান নন?

এনায়েত। হ্যাঁ—আমি মুসলমান। কিন্তু একদিন আমি হিন্দু ছিলুম, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করতুম—সন্ধ্যা-সকাল মন্দিরে মন্দিরে

যখন কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠতো, আমার সমস্ত মন-প্রাণ ভগবানের উদ্দেশে লুটিয়ে পড়তো। আরাবল্লীর শিখরে শিখরে রাজপুত-বালকেরা যখন পাথর ছোড়াছুঁড়ি করতো, আমি তখন ভাবতুম—কতদূরে ঐ বৈকুণ্ঠের স্বপ্নপুরী, কতদিনে যাবো আমি সেই আনন্দধামে!

আলেয়া। এমন নিষ্ঠাবান হিন্দু আপনি, আজ এমন গোঁড়া মুসলমান হলেন কি করে?

এনায়েত। সেই আমার জীবনের সবচেয়ে করুণ ইতিহাস। শৈশবে এক রাজপুতের কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল; বহুদিন সে পিত্রালয়ে ছিল। একদিন শুনলুম, তার পিতা মুসলমান হয়ে গিয়েছে। বাপ-মা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, স্ত্রীকে ত্যাগ করতে বললেন; আমি বিদ্রোহ করলুম, সাতদিন সাত রাত্রি চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে ফেললুম অভাগিনী স্ত্রীর জন্য, কিন্তু মাতা-পিতার মন ভিজলো না; সমাজ আমার উপর অমানুষিক নির্যাতন করলে! মনে ঘৃণা হলো—এই সনাতন ধর্ম। পাগল হয়ে ছুটে এলুম, দেখলুম অগ্নিদাহে শ্বশুরের ভিটে ছাই হয়ে গেছে। সেই হতে আমি মুসলমান।

আলেয়া। কি নাম ছিল আপনার?

এনায়েত। কি হবে বালক, সে কথা শুনে?

আলেয়া। আপনার স্ত্রীর নাম কি?

এনায়েত। থাক—থাক, ও কথা তুলো না। মাথায় খুন চাপে হিন্দু-সমাজটাকে সমূলে ধ্বংস করতে প্রাণটা নেচে ওঠে।

কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। সোনা—সোনা! কই সোনা—কোথা সোনা? কেউ সাড়া দেয় না রে! দিনের পর দিন অনাহারে অনিদ্রায় ছুটে এলুম,

কেউ বললে না যে, তাকে দেখেছি। আর তো চলতে পারি না, মাথার উপর যেন বিশ্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। ফিরিয়ে দে— ফিরিয়ে দে নিষ্ঠুর দেবতা!

আলেয়া। কে গা তুমি উন্মাদের মত নদীর দিকে ছুটছো? দেখছো না নদীর ভীষণ জলস্রোত? মরবে যে!

কাঞ্চন। মরবো—মরবো, মরতেই আমি চাই। বেঁচে আর কি হবে আমার? বংশের সুনাম গেছে—উঁচু মাথা হেঁট হয়েছে; হয়তো নদীর ওই জলতলে সে আমার ডুবে মরেছে। সোনা—সোনা! ভয় নেই, আমি যাবো তোর সঙ্গে—

আলেয়া। তুমি কি তবে বীরবর কেদার রায়ের পুত্র কাঞ্চন?

এনায়েত। কে—কে?

কাঞ্চন। তুমি—তুমি কে? বালক! তোমায় দেখে আমার মনটা আশায় আন্দোলিত হচ্ছে। বল, তুমি কি আমার সোনার সন্ধান জান?

আলেয়া। না ভাই, জানি না। তবে এ কথা সত্য যে, সোনাকে সে নিয়ে গেছে ঈশা খাঁর কামানলে আহুতি দিতে।

কাঞ্চন। ঈশা খাঁ? হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আমি তাহলে সোনার গাঁর দিকে চললুম। ঈশা খাঁ! ঈশা খাঁ! তোমার চুলের মুঠি ধরে টেনে শ্রীপুরে এনে জীবন্ত সমাধি দেবো।

এনায়েত। দাঁড়াও, একটা কথা আছে।

কাঞ্চন। কি?

এনায়েত। তুমি সেই কাঞ্চন না, যে কলাগাছিয়া দুর্গ ভস্মীভূত করেছে?

কাঞ্চন। হ্যাঁ—আমি।

এনায়েত। ঈশা খাঁর পত্র দু'পায়ে মাড়িয়েছিলে, তুমিই না?

কাঞ্চন। হ্যাঁ—আমিই সেই।

এনায়েত। তবে দাঁড়াও, আজ সে ঔদ্ধত্যের ঋণ কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে যেতে হবে।

কাঞ্চন। তুমি কে?

এনায়েত। আমি এনায়েত খাঁ।

কাঞ্চন। এনায়েত খাঁ—ঈশা খাঁর বন্ধু?

এনায়েত। শুধু তাই নয়, সোনাকে চুরি করে আনবার জন্য শ্রীমন্তকে বশীভূত করেছি আমি।

আলেয়া। তুমি?

কাঞ্চন। এনায়েত! এনায়েত! কি করবো তোমায় এনায়েত খাঁ? তুমি যা করেছ, সপ্তপুরুষ ধরে এ কলঙ্ক আমাদের গায়ে ছাপ মারা থাকবে। তোমার মাথাটা ছাতু করে আকাশে উড়িয়ে দিলেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

আলেয়া। কোথায় রেখেছ তুমি সোনাকে?

কাঞ্চন। বল—বল, কোথায় সোনা—কোন পথে গেছে সোনা?

এনায়েত। সোনারগাঁর পথে।

কাঞ্চন। কোনদিকে পথ—কোনদিকে? ওই যে একটা বজরা যাচ্ছে না? কারা ও? সোনা—সোনা—

নেপথ্যে স্বর্ণময়ী। দাদা—

কাঞ্চন। ওই যে! পেয়েছি—পেয়েছি—

এনায়েত। চুপ! এক পাও এগিয়ো না, তাহলে এই তরবারি তোমার শিরশ্ছেদ করবে।

কাঞ্চন। এনায়েত খাঁ! ছাড়—ছাড়! তোমার ধর্মের দোহাই! দেখ, অসহায়া নারী জগতের করুণার পাত্রী! দয়া কর! আমি সব

শত্রুতা ভুলে যাবো—তোমার গোলাম হয়ে থাকবো। নিয়ে গেল! এনায়েত! ওঃ—কি করবো?

এনায়েত। কি করবে? এই তরবারির নীচে মাথা বাড়িয়ে দাও।

আলেয়া। খবরদার এনায়েত খাঁ! এই তরবারিখানা আমি তোমায় দিয়েছি আত্মরক্ষা করতে, দুর্বলের উপর অত্যাচার করতে নয়।

এনায়েত। যাও—যাও, বিরক্ত করো না।

কাঞ্চন। এনায়েত! আমি দীর্ঘ অনশনে দুর্বল, নইলে তোমার মত একটা মূষিক আমায় স্পর্শ করতে পারতো না। আচ্ছা এসো দেখি কার কত শক্তি! [ এনায়েত ও কাঞ্চনে সংঘর্ষ ]

আলেয়া। সোনা—সোনা! রাজকুমারী!

নেপথ্যে স্বর্ণময়ী। দাদা—দাদা!

আলেয়া। শ্রীমন্ত! নৌকা রাখ।

এনায়েত। চালাও—চালাও, ঈশা খাঁর আদেশ।

কাঞ্চন। ওঃ—[ অবসন্নদেহে উপবেশন ]

এনায়েত। থাকো এইখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। না—তোমায় বাঁচিয়ে রাখবো না; তাহলে একদিন অতর্কিত আক্রমণে সোনারগাঁ দুর্গটাও ভস্মীভূত হবে। [ তরবারি উত্তোলন ]

আলেয়া। সাবধান এনায়েত খাঁ! নিরস্ত্রের উপর অস্ত্রাঘাত অধর্ম।

এনায়েত। আমার ধর্মাধর্ম আমি বুঝবো, তুমি বাধা দেবার কে?

আলেয়া। আমি বাধা দেবার কে? আমি প্রভু, তুমি গোলাম; আমি পা বাড়িয়ে দেবো, তুমি লেহন করবে। [ উষ্ণীষ উঠাইয়া অনাবৃত মস্তক দেখাইল ] চিনতে পার?

এনায়েত। শাহজাদি? সেলাম—সেলাম। [ প্রস্থান।

কাঞ্চন। সোনা—সোনা! নিয়ে গেছে—জন্মের মত নিয়ে গেছে।

দেহে এমন শক্তি নেই যে, ছুটে গিয়ে ধরি। উঃ—কোটিশ্বর! শেষে এই করলে, হাতের মুঠোয় এনে ছিনিয়ে নিলে?

আলেয়া। কি করি! সোনাকে রক্ষা করবো—না এই মুমূর্ষুর শুশ্রূষা করবো? ভাই! আমার কোলে মাথা রেখে একটু সুস্থ হও। দেখ, আমি সজ্ঞানে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি, আমি বলছি সোনাকে তুমি নিশ্চয়ই ফিরে পাবে।

কাঞ্চন। পাবো? পাবো? কে তুমি বান্ধব, আমায় এমন অভয়-বাণী শোনালে? আমার মনে হচ্ছে, তোমার কথা মিথ্যা হবে না। পাবো—নিশ্চয় পাবো, নইলে সংসার মিথ্যা—দেবতা মিথ্যা—ধর্ম মিথ্যা। ওই যে জলস্রোত তীরবেগে ছুটেছে, দিই ঝাঁপ! জয় কোটিশ্বর—

[ প্রস্থান।

আলেয়া। সর্বনাশ! জলে ঝাপ দিলে যে! কুমার—কুমার!

[ প্রস্থান।

নেপথ্যে কাঞ্চন। সোনা—সোনা—

---

## তৃতীয় দৃশ্য

সোনারগাঁ—ঈশা খাঁর কক্ষ

**পত্রহস্তে ঈশা খাঁর প্রবেশ।**

ঈশা খাঁ। বান্দা—বান্দা!

**বান্দার প্রবেশ।**

বান্দা। জাঁহাপনা—

ঈশা খাঁ। কি বলছিলে তুমি? সোনাকে নিয়ে শ্রীমন্ত আসছে? তুমি দেখেছ?

বান্দা। না জাঁহাপনা, আমি দেখিনি; উজীর সাহেবের কাছে সংবাদ এসেছে, আমি সে সংবাদ আপনাকে জানাতে গিয়েছিলুম।

ঈশা খাঁ। বটে—বটে! তুমি একথা অনেকবার বলেছ। কিন্তু বান্দা, সোনা কে জান? চাঁদ রায়ের কন্যা—নিষ্ঠাবান হিন্দু চাঁদ রায়ের একমাত্র সন্তান! শ্রীমন্ত তাকে নিয়ে আসছে আমার সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য।

বান্দা। বিবাহ! চাঁদ রায়ের মত আছে?

ঈশা খাঁ। না—না, চুরি করে নিয়ে আসছে।

বান্দা। আপনি তাকে বিবাহ করবেন?

ঈশা খাঁ। তোমার কি মনে হয়?

বান্দা। আমার মনে হয়, আমার প্রভু এমন পশু নন যে, এক হিন্দুনারীকে চুরি করে এনে বিবাহ করবেন। সত্য বটে, আপনার সঙ্গে চাঁদ রায়ের মর্মান্তিক শত্রুতা, কিন্তু তার মেয়ে তো কোন অপরাধ করেনি? অসহায়া দুর্বলা নারীর উপর এই অত্যাচার আর যেই করুক, বীরবর ঈশা খাঁ কখনও করতে পারেন না। যদি করেন, বুঝবো, তিনি ইসলামের শত্রু—তিনি এই গরীব বান্দার চেয়েও হীন।

ঈশা খাঁ। কিন্তু বিবাহ তো অত্যাচার নয়।

বান্দা। বিবাহ কথাটা তো ছলনার মুখোস মাত্র জাঁহাপনা! আপনি একে যে নামই দিন, এ নারীনির্যাতন ছাড়া আর কিছুই নয়!

ঈশা খাঁ। তাই তো বান্দা, তুমি যা বলছো, এনায়েত খাঁ তো তা বলছে না!

বান্দা। আমি গরীব বান্দা, এনায়েত খাঁর মত রাজনীতি কোথায়

পাবো জনাব? কিন্তু একটা কথা বলতে পারি, দুনিয়ার ইসলামের দুটো শত্রু থাকে, এনায়েত খাঁ তার একজন।

ঈশা খাঁ। এনায়েত খাঁ ইসলামের শত্রু?

বান্দা। সহস্রবার। সে না হিন্দু, না মুসলমান, হিন্দুর মাংস সে কামড়ে খায়, আর উগরে ফেলে মুসলমানের গায়ে।

ঈশা খাঁ। তুমি তাহলে কি করতে বল?

বান্দা। ক্ষমা করবেন জনাব! সুলতান ঈশা খাঁকে পরামর্শ দিই, এতবড় স্পর্দ্ধা আমার নেই। কিন্তু আপনি চাঁদ রায়ের অমতে, তার কন্যার হাহাকারের মধ্যে যদি তাকে বিবাহই করেন, জানবো এই অধর্মের রাজ্য আর বেশীদিন নয়, আর সেই দিন বাংলার সব মুসলমান যদি আপনাকে বাহবা দেয়, এই গরীব দুর্বল বান্দা একাই আপনার বিপক্ষে লাঠি ধরে দাঁড়াবে। [ প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। এনায়েত! এনায়েত! দেখে যাও, এক দীন দরিদ্র বান্দা—তার প্রাণ কত মহৎ, আর তুমি আমার দশহাজারি মনসবদার, তোমার প্রাণটা কি পশুত্বে ভরা। ঠিক বলেছ বান্দা! লোকের তোষা-মোদ শুনতে শুনতে মনটা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, এমনি একটি বন্ধু আমি চাই, যে আমায় চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে পারে।

গীতকণ্ঠে বাঈজীগণের প্রবেশ।

বাঈজীগণ।—

## গীত

ভাবনা কি আর, আসবে বঁধু মনিব তোমায় চোখ রাঙাতে।
গলায় দিতে প্রেমের দড়ি শীতের রাতে ঘুম ভাঙাতে।
যতই তুমি এগিয়ে যাবে, বলবে বঁধু "চাইনে",
বাঁয়ে যদি চলতে বল, চলে যাবে ডাইনে,

যদি না সইতে পার, মিছে কেন বচন ঝাড়,
পুরনো চাল বাড়বে ভাতে, কাজ কি নতুন সাঙাতে ?

ঈশা খাঁ। আলেয়া কোথায় গেছে বলতে পার ?

১ম বাঈজী। না জনাব !

ঈশা খাঁ। কোথায় গেল, কেউ জানে না ! এ কি একটা পাখী যে অলক্ষ্যে উড়ে গেছে ? আচ্ছা—যাও তোমরা, চাঁদ রায়ের কন্যা এলে তাকে সংবর্ধনা করবে। [ বাঈজীগণের প্রস্থান। ] সোনা—হৃদয়ের আনন্দদায়িনী সোনা—জাগ্রতে চিন্তা—নিশীথের স্বপ্ন আজ আমার দ্বারদেশে উপস্থিত। যে সুধার সন্ধানে দিশেহারা পথিকের মত উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছি, আজ সে সুধার ভাণ্ড আমার করতলগত। কি করবো—কি করবো ?

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। আকণ্ঠ পান কর।

ঈশা খাঁ। গুরুজী—এসেছ ? সোনাকে নিয়ে এসেছ ?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ জাঁহাপনা, হুকুম করলেই সে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হবে।

ঈশা খাঁ। না-না-না, নিয়ে যাও—ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

শ্রীমন্ত। ফিরিয়ে নিয়ে যাবো ? ঈশা খাঁ ! তুমি সোনাকে চাও না ?

ঈশা খাঁ। গুরুজী ! কেমন করে বোঝাবো তোমায়, আমার প্রাণটা সোনার জন্য কতখানি পাগল ? যেদিন অস্তোন্মুখ সূর্যের রক্তিম কিরণে তার সেই অতুল রূপরাশি দেখেছি, সেই দিন হতে সংসারের সব চিন্তা বিসর্জন দিয়ে আমি শুধু তারই রূপ ধ্যান করেছি ! বুকটা চিরে যদি দেখাতে পারতুম গুরুজী, দেখতে—আমার অস্থিপঞ্জরে তারই

নাম লেখা। তবু এ হয় না ব্রাহ্মণ! নারীর দরবিগলিত অশ্রুধারার মধ্যে তাকে জোর করে আমি বিবাহ করতে পারবো না।

শ্রীমন্ত। বিবাহ ছাড়াও অন্য উপায় আছে।

ঈশা খাঁ। ছিঃ-ছিঃ, ব্রাহ্মণ! ঈশা খাঁর সহস্র অপরাধ থাকতে পারে, কিন্তু সে লম্পট নয়।

শ্রীমন্ত। তুমি কি মনে করেছ ঈশা খাঁ, বিবাহ না করলেই লোকে তোমাকে সাধু বলে বাহবা দেবে? তা নয় জাঁহাপনা! যে মুহূর্তে তুমি সোনাকে ঘরের বাইরে এনেছ, সে মুহূর্তেই তুমি লম্পট সেজেছ।

ঈশা খাঁ। বল কি ব্রাহ্মণ?

শ্রীমন্ত। ঠিকই বলেছি জাঁহাপনা! বল, এখন কি করতে চাও?

ঈশা খাঁ। গুরুজী! আমি দোজাকের পথে অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি, তবু বিনা অপরাধে একটা নারীর সর্বনাশ করতে আমার হাত উঠবে না। বলুক লোকে আমায় লম্পট, তবু চাঁদ রায়ের নামে এতবড় কলঙ্ক দিতে পারবো না।

শ্রীমন্ত। চাঁদ রায় তো তোমাকে এতটুকু দয়া করেনি জাঁহাপনা! তুমি অসীম অনুগ্রহে তার সঙ্গে আত্মীয়তা করতে গিয়েছিলে, সে তোমায় কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে। তোমার ত্রিবেণী দুর্গ অধিকার করেছে—কলাগাছিয়া দুর্গে নিশীথ অন্ধকারে অগ্নিসংযোগ করে সবাইকে পুড়িয়ে মেরেছে—

ঈশা খাঁ। গুরুজী! গুরুজী! আমায় আর পাগল করো না!

শ্রীমন্ত। স্বর্ণদ্বীপের নিরীহ প্রজাগুলোর রক্তে শ্যামল ভূমি রঞ্জিত করেছে তারা, তুমি দুর্বল—তার প্রতিশোধ নিতে পারনি; মনে করেছ কি তাদের উদ্ধত গতির এইখানেই শেষ হবে? না জাঁহাপনা! দু'দিন পরে তারা তোমার সোনারগাঁ-প্রাসাদ ধূলিসাৎ করে, তোমায় বন্দী করে—

ঈশা খাঁ। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! নাঃ, কিসের দয়া! চাঁদ রায় পরম শত্রু আমার; তার উপর এমন প্রতিশোধ নেবো যে, সেকথা স্মরণ করে তার অন্তরাত্মা মৃত্যুর পরও শিউরে উঠবে। যাও ব্রাহ্মণ, নিয়ে এসো চাঁদ রায়ের কন্যাকে, পিতার অপরাধ কন্যার লাঞ্ছনায় ধৌত হোক।

[ প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। চাঁদ রায়! কেদার রায়! এইবার দেখবো, তোমরা কত সইতে পার!

গীতকণ্ঠে সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন।—

গীত

ওরে পিছন ফিরে চা।
রাগের বশে মারিসনে রে নিজের বুকে বাজের ঘা॥
বনের বাঘা থাক রে বনে, নিসনে ডেকে ঘরে,
সে যে তোর বুকেও মারবে থাবা, চাটবে না গা আদর করে,
ঘরের ঠাকুর ফেলে ভুলে, পরের কুকুর নিসনে তুলে,
আপন মায়ের মাথার 'পরে রাগে তুলে দিসনে পা।
হোক না রে তোর দুঃখভূমি, তবু জন্মভূমি মা।

[ প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। সোনা—সোনা—

স্বর্ণময়ীর প্রবেশ।

স্বর্ণময়ী। এ কোথায় এলুম গুরুদেব? এই কি চন্দ্রদ্বীপ?

শ্রীমন্ত। না, সোনারগাঁ।

স্বর্ণময়ী। সোনারগাঁ? ঈশা খাঁর সোনারগাঁ?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ—এই তার প্রাসাদ।

স্বর্ণময়ী। তবে এ চন্দ্রদ্বীপ নয়? আমার শ্বশুরালয় নয়? এখানে আমায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্য?

শ্রীমন্ত। উদ্দেশ্য, ঈশা খাঁর সঙ্গে তোর বিবাহ দেওয়া।

স্বর্ণময়ী। গুরুদেব! গুরুদেব! না—না, এ কি হতে পারে? সাতপুরুষ ধরে এই দুই বংশের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ, জ্ঞান হবার পর থেকে পিতাকে যে চোখে দেখেছি, আপনাকে সেই চোখে দেখে আসছি—

শ্রীমন্ত। সেদিন আর নেই বালিকা। চাঁদ কেদার আমায় ত্যাগ করেছে—

স্বর্ণময়ী। সে তো ত্যাগ নয় গুরুদেব, গুরুর উপর শিষ্যের অভিমান।

শ্রীমন্ত। এই অভিমানের যূপকাষ্ঠে আমার নিষ্পাপ শিশু প্রাণ দিয়েছে—ওঃ, সে কি শোচনীয় মৃত্যু! সোনা! তোমাদের সবাইকে একসঙ্গে বলি দিলেও এর শোধ হবে না।

স্বর্ণময়ী। এ আপনি কি বলছেন গুরুদেব? আমার বড় ভয় হচ্ছে। চলুন, চন্দ্রদ্বীপে যাবার জন্য আমার মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে; না হয় শ্রীপুরেই ফিরে চলুন, এখানে আর এক মুহূর্তও আমি থাকতে পারবো না।

শ্রীমন্ত। পারতে হবে নারী, এই তোমার ভবিষ্যতের আশ্রয়।

স্বর্ণময়ী। ঠাকুর! দেখি তোমার মুখখানা! চিরদিন যে পবিত্র মুখ দেখে অনন্ত দুঃখ ভুলে গিয়েছি, দেখি সে মুখে আজ পশুত্বের ছাপ পড়েছে কি না? গুরু! পিতা গড়েছেন দেহ, তুমি গড়বে মন; পিতা দেখিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর আলো বাতাস, তুমি দেখাবে ধর্মের পথ; সেই তুমি আমার হাত ধরে অধর্মের পথে টেনে আনবে? আমি

নারী—বিধবা, নিঃসংশয়ে নিশীথ রাতে তোমার হাত ধরে চলে এসেছি ; এতবড় বিশ্বাসের এই কি প্রতিদান? তাহলে আজ হতে কোন কন্যা পিতাকেও আর বিশ্বাস করবে না।

শ্রীমন্ত। বাচালতা রাখ বালিকা, ওসব স্নেহের আবদার আজ আর চলবে না।

স্বর্ণময়ী। গুরু! তোমার ছেলে-মেয়েরা বোধ হয় কোনদিন তোমায় 'বাবা' বলে ডাকেনি? তা যদি হতো, তাহলে আজ আমার মুখের দিকে চেয়ে তোমার হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীগুলো সমস্বরে বেজে উঠতো।

শ্রীমন্ত। সোনা! বেশি উত্যক্ত করো না আমায় ; আমি ওসব অনেক দেখেছি।

স্বর্ণময়ী। দেখবার চোখ তোমার আছে? যদি থাকতো, আমার এই উপবাসক্লিষ্ট মুখ দেখে তোমার চোখ ফেটে জল বেরুতো ঠাকুর! আমি এখনও একাদশীর পারণ করিনি, আজ চার দিন এক ফোঁটা জলও মুখে দিইনি, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। দয়া কর—আমায় শ্রীপুরে নিয়ে চল।

শ্রীমন্ত। বটে! তোমায় শ্রীপুরে নিয়ে যাই, আর চাঁদ কেদার আমার টুঁটি কামড়ে ধরুক!

স্বর্ণময়ী। তাঁরা তো বন্দী।

শ্রীমন্ত। মিথ্যা কথা, চাঁদ কেদার বন্দী নয়, কাঞ্চনও মরেনি।

স্বর্ণময়ী। গুরু! যাক, তবু একটা সুসংবাদ শোনালে গুরু, দাদা বেঁচে আছে ; তবে কি নদীর পার থেকে দাদাই আমায় ডাকছিল? ওঃ—আগে যদি একথা জানতুম, আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে তোমার সব শত্রুতার কণ্ঠরোধ করতুম, আর কোন উপায় নেই। চারিদিকে

কঠিন পাষাণ-প্রাচীর বাঘের মত থাবা পেতে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে আমি এক অসহায়া দুর্বলা নারী! কি করবো—কোনদিকে যাবো? কোটিশ্বর—কোটিশ্বর! পথ দেখিয়ে দাও—[ প্রস্থানোদ্যতা ]

শ্রীমন্ত। পথ নেই নারী—[ হাত ধরিয়া আকর্ষণ ]

স্বর্ণময়ী। ঠাকুর! দোহাই তোমার, আমি তোমার কন্যা, দয়া কর—[ পদধারণ ]

শ্রীমন্ত। দয়া নেই—[ পা ছাড়াইয়া লইল ]

স্বর্ণময়ী। উঃ—মাগো! তুমি বাধা দিয়েছিলে, তোমার কথা শুনিনি; আমার লাঞ্ছনা হবে না? ব্রাহ্মণ! তোমাকে আর কি বলবো? আমি বিধবা—আজীবন ব্রহ্মচারিণী—একাদশীর পর এখনও মুখে জল দিইনি; আমি তোমায় এই অভিশাপ দিচ্ছি, যার অনুগ্রহের আশায় তুমি আমার সর্বনাশ করতে চলেছ, সে যেন একদিন তোমায় দুপায়ে মাড়িয়ে যায়—যেন কুষ্ঠব্যাধিতে তোমার গায়ের মাংস পচে গলে খসে পড়ে—হাহাকারে আর্তনাদে অনুতাপে জর্জরিত হয়ে যেন তোমার এই ঘৃণিত জীবন শেষ হয়ে যায়—[ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল ]

শ্রীমন্ত। সোনা—সোনা—

ঈশা খাঁ ও বান্দার প্রবেশ।

ঈশা খাঁ। কই সোনা? আমার বহুদিনের বাঞ্ছিত রত্ন, চাঁদ রায়ের কন্যা কই গুরুজী? [ অগ্রসর হইয়া ] এ কি, বিধবা?

বান্দা। হিন্দুর বিধবা। ওঃ—জাঁহাপনা! আপনি কি করলেন?

ঈশা খাঁ। ভুল করেছি—ভুল করেছি। কেউ তো আমাকে বলেনি যে, সোনা বিধবা!

শ্রীমন্ত। বিধবা হলেই বা তোমার কি যায় আসে ঈশা খাঁ?

ঈশা খাঁ। তা বটে গুরুজী! শত্রু—শত্রু, তার আবার জাত কি? দেখ তো ব্রাহ্মণ, মূর্ছিত না মৃত? কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে আছ কি ব্রাহ্মণ? ব্যজন কর। বান্দা! দেখ—দেখ, চাঁদ রায়ের কন্যা ধূলি-শয্যায়! সূর্য যার মুখ দেখতে পায়নি, সে আজ দশের সমক্ষে অনাবৃত।

বান্দা। তুমি চাঁদ রায়ের গুরু না? তুমি ব্রাহ্মণ—না চণ্ডাল?

শ্রীমন্ত। সোনা! ওঠো—সম্মুখে তোমার ঈশা খাঁ।

স্বর্ণময়ী। এঁ্যা—এঁ্যা—ঈশা খাঁ! কে তুমি? দেখ, আমি হিন্দু-বিধবা, পরপুরুষের ছায়া মাড়ানোও আমার পাপ। তুমি রাজরাজেশ্বর, তুমি জ্ঞানী, আমার মান-সম্ভ্রমের দায় তোমার হাতে সমর্পণ করলুম। বল—আমায় রক্ষা করবে, না বলি দেবে?

ঈশা খাঁ। নির্ভয় রাজকুমারী! আমি তোমায় রক্ষা করলুম। বান্দা! রাজকুমারীকে শ্রীপুরে রেখে এসো।

স্বর্ণময়ী। এত মহান তুমি ঈশা খাঁ? কি বলে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাবো? তুমি দীর্ঘজীবী হও—তুমি সম্রাট হও—বিশ্বজগত তোমায় নামে চির-মুখরিত হোক।

ঈশা খাঁ। যদি প্রয়োজন হয়, আমি নিজে বজরা নিয়ে তোমার সঙ্গে যেতে পারি।

স্বর্ণময়ী। না জাঁহাপনা, আমি একাই যেতে পারবো, আর বজরার প্রয়োজন নেই। বজরা চলতে পারবে না, আমি ছুটতে ছুটতে যাবো। বিদায় জাঁহাপনা— [ প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। বান্দা! রাজ্যে ঘোষণা করে দাও, যদি পথে কেউ এই নারীর কেশাগ্রও স্পর্শ করে, তার কাঁধে মাথা থাকবে না।

বান্দা। কি ঠাকুর, দাঁড়িয়ে দেখলে মুসলমানের বিচার? তুমি গুরু হয়ে যাকে বলি দিতে গিয়েছিলে, জাঁহাপনা শত্রু হয়ে তাকে

রক্ষা করলেন। হাসবে, না কাঁদবে? ধন্যবাদ দেবে, না অভিশাপ দেবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! [ প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। এ কি করলে ঈশা খাঁ?

ঈশা খাঁ। পাগলের খেয়াল ঠাকুর!

শ্রীমন্ত। তোমার খেয়ালের দায়ে আমার যে প্রাণটা যাবে, তা ভেবেছ?

ঈশা খাঁ। ভেবেছি ঠাকুর, তোমার ওই কুকুরের প্রাণ যাওয়াই ভাল।

শ্রীমন্ত। ভণ্ড! শঠ! মিথ্যাবাদী! তোমার ধ্বংস হোক। [ প্রস্থানোদ্যত ]

ঈশা খাঁ। দাঁড়াও ঠাকুর! আপাতত তুমি আমার প্রাসাদে অতিথি; পালাবার চেষ্টা যদি কর, এই তরবারি তোমার শিরশ্ছেদ করবে।

শ্রীমন্ত। কোটিশ্বর! ঠিক বিচার করেছ, এই আমার প্রাপ্য।
[ প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। প্রতিশোধ নিয়েছি চাঁদ রায়, তোমার এতখানি অত্যাচারের চরম প্রতিশোধ নিয়েছি।

এনায়েতের প্রবেশ।

এনায়েত। সোনা কই—সোনা?

ঈশা খাঁ। ফিরিয়ে দিয়েছি।

এনায়েত। ফিরিয়ে দিয়েছ? কেন?

ঈশা খাঁ। বিনা অপরাধে নারীর উপর এ অত্যাচার আমি করতে পারলুম না এনায়েত!

এনায়েত। পারলে না? তোমার ভগ্নী আলেয়া যে কাঞ্চনের কবলে, সংবাদ রাখ?

ঈশা খাঁ। কি—কি? আলেয়া কাঞ্চনের কবলে? সত্য? সত্য বলছো এনায়েত? কোথায় তারা?

এনায়েত। এতক্ষণে বোধহয় শ্রীপুরের অন্তঃপুরে।

ঈশা খাঁ। ওঃ! চাঁদ রায়—চাঁদ রায়! নাঃ—মিত্রতা হবে না। কি করবো বল তো এনায়েত?

এনায়েত। সোনাকে ফেরাও—

ঈশা খাঁ। তা হয় না এনায়েত! ঈশা খাঁ যাকে একবার অভয় দিয়েছে, তার কেশাগ্রও সে স্পর্শ করবে না। এনায়েত! সৈন্য সাজাও; আমার যেখানে যত সৈন্য আছে, সবাইকে একত্রিত কর; শ্রীপুর ধ্বংস করবো—শ্রীপুর ধ্বংস করবো। বান্দা—

এনায়েত। [ স্বগত ] আলেয়া! বড় দর্প তোমার, এই এক আঘাতেই তোমার সব দর্প চূর্ণ করবো।

[ প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। বান্দা!

বান্দার পুনঃ প্রবেশ।

বান্দা। জাঁহাপনা—

ঈশা খাঁ। আমি শ্রীপুর ধ্বংস করতে যাচ্ছি; দুর্গের ভার তোমার উপর রইলো। রক্ষা করতে পারবে?

বান্দা। আমি? জাঁহাপনা! আমি গরীব বান্দা—

ঈশা খাঁ। তবু তুমি মানুষ, তুমি ছাড়া আমি আর কাউকে বিশ্বাস করি না। বল, রক্ষা করতে পারবে?

বান্দা। পারবো কিনা জানি না, তবে প্রয়োজন হলে প্রাণটা দিতে পারবো।

ঈশা খাঁ। ব্যস। এনায়েত খাঁ! সাজাও বাহিনী—ওড়াও ধ্বংস-নিশান—　　　　[ প্রস্থান।

বান্দা। খোদা! শক্তি দাও

[ প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

পথ

দিলপিয়ার ও গুলবাহারের প্রবেশ।

গুলবাহার। এঃ—জাঁহাপনা শেষকালে একটা হিন্দুর মেয়ে ফুসলে আনলে? তোবা—তোবা! তারা গরুগুলোকে দেবতা বলে পূজো করে—তাদের বিধবাগুলো এক বেলা খায়, খামকা একাদশী করে দাঁত ছিরকুটে পড়ে থাকে।

দিলপিয়ার। থাহে—থাহে, তর কি?

গুলবাহার। না, আমার আর কি? তবে কথাটা হচ্ছে এই, জাঁহাপনা শ্রীপুরে গেল মেয়ে খুঁজতে, আর আমি যে এমন রূপের খনি—চোখের কাছে ঘুরে বেড়াই, আমাকে মিন্সে একবার দেখলে না?

দিলপিয়ার। বাহার! তুই ব্যাগম অবি?

গুলবাহার। ইচ্ছা তো খুব, কিন্তু তুই যে ছাড়িসনে!

দিলপিয়ার। ছাড়ুম—ছাড়ুম—এইবার ঠিক ছাড়ুম, খোদার কসম!

গুলবাহার। বলিস কি? এত দয়া?

দিলপিয়ার। আরে, দয়া না—দয়া না। সত্যি বাহার, তোর

যে রূপ, তোর ব্যাগম হওয়াই সাজে। আমি গরীব, তোরে প্যাট ভইরা খাইতে দিতে পারি না, বালো একখানা কাপোর দিতে পারি না, দুঃখে আমার কইলজা ফাটে। আমার গর নাই—দুয়ার নাই, তোরে আমি রাখি কই ?

গুলবাহার। তবে এতদিনে বুঝেছিস ?

দিলপিয়ার। খুব বুঝছি রে, খুব বুঝছি! তুই যা। তোর যে রূপ, একবার কইলেই খাঁয়ের পো তোরে ব্যাগম কইর‍্যা দিব। তুই সারা গায় গয়না পরবি, পাছাপাইর‍্যা কাপোর পরবি, রূপের জলুসে ঘরবারি আলো করবি। না থাকলি তুই আমার, তবু তোরে একবার দেখলেও চোখ দুইটা জুড়াইয়া যাইব।

গুলবাহার। তারপর তুই যদি দাবী করিস ?

দিলপিয়ার। করুম না—করুম না; তোর সুখের জন্য তোরে আমি তালাক দিতে পারি।

গুলবাহার। পিয়ার !

দিলপিয়ার। তারাতারি চইল্যা যা; তোরে পাইলে খাঁয়ের পো সোনারে ছাইর‍্যা দিব! আহা রে, হিন্দুর মাইয়া—তার উপর রারী, না জানি কত কাদতে আছে! আহ, তারে যদি না ছারে, তুই ব্যাগম অইয়া তারে ছাইর‍্যা দিস!

গুলবাহার। তুই তাকে বিয়ে করবি ?

দিলপিয়ার। [ জিভ কাটিয়া কান মলিয়া ] ছিঃ, পরের বৌ মায়ের সামিল।

গুলবাহার। তাহলে আমি যাই। সত্যি পিয়ার, তোর উপর আজ আমার ভক্তি হচ্ছে। [ নতজানু হইয়া ] অনেক দোষ করেছি, মাফ করিস।

দিলপিয়ার। না—না, তুই কোন দোষ করিস না; দোষ আমার, অনেক দোষ। যা তবে, যা—

গুলবাহার। তুই এখন কোথায় যাবি?

দিলপিয়ার। যামু না কোনহানে; একটা মজিদে পইর‍্যা থাকুম, আর দিনরাত আল্লারে ডাকুম। এই ফকিরই এখন থিহা আমার সম্বল।

গুলবাহার। আচ্ছা, তাহলে আমি যাই—[ প্রস্থানোদ্যত ]

দিলপিয়ার। বাহার! [ বাহার ফিরিল ] পাঁচ বছর গর করলাম, আমার জন্য এক ফোটা চহের জলও পরলো না তোর? একটু দারা, আর একবার তোরে দেহি।

## গীত

দিলপিয়ার।—বাহার! একটুখানি দাবা।
গুলবাহার।—পথ ছেড়ে দে, বাঁধিস না রে, আমার আখের যাবে মারা॥
দিলপিয়ার।—দুইডা কথা যা কইযা, যা বাঙা ঠোঁটে হাসি,
গুলবাহার।—খুলে যদি ফেলেছিস রে, পরবাসনে আর ফাঁসি,
দিলপিয়ার।—কি পাষাণ কইলজাডা তোর, চহে জল ঝরতেছে মোর,
গুলবাহার।—মুছে ফেল ও মেবিজান [ তোর ] দুই নয়নের ধারা।

[ গুলবাহারের প্রস্থান।

দিলপিয়ার। খাঁয়ের পো, তোমারে ব্যাগম দিলাম। [ চোখে জল আসিল ] আল্লা! দুনিয়ার মঙ্গল কর—দুনিয়ার মঙ্গল কর। [ প্রস্থানোদ্যত ]

### আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। হজরত! একটু আশ্রয় দিতে পারেন?

দিলপিয়ার। কে, হুজুরাইন না! আরে, এ ব্যাশে কোহানে যাবা হুজুরাইন?

আলেয়া। চিনতে পেরেছ দিলপিয়ার ?

দিলপিয়ার। চিনুম না ? এ কি একদিনের দেহা ? সোনার খপর সব জান তো হুজুরাইন ?

আলেয়া। জানি। বাহার কই ?

দিলপিয়ার। জাঁহাপনার কাছে পাঠাইয়া দিছি ; দেহি, তারে পাইয়া সোনারে যদি ছারে।

আলেয়া। আর তুমি ?

দিলপিয়ার। আমার এই ফকিরি।

আলেয়া। ঈশা খাঁ ! ঈশা খাঁ ! দেখে যাও—তোমার একটা ভৃত্য, তার প্রাণটা কত মহান ! আর তুমি—ওঃ ! যাও হজরত, যাও ; তোমার ফকিরিই সার্থক ! সংসারের বন্ধন খুলেছ যদি, আর সে বন্ধনে ধরা দিও না। সেলাম—সেলাম !

দিলপিয়ার। খোদা ! দুনিয়ার মঙ্গল কর—দুনিয়ার মঙ্গল কর—

[ প্রস্থান।

আলেয়া। ভাই ! ভাই ! কি করলে তুমি ? আমার যে লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ছে। ভগবান ! তোমার সৃষ্টির মধ্যে কেন এত অশান্তি, কেন একজন আর একজনের সুখের সংসারে দাবানল জ্বেলে দেয় ? শান্তি দাও—শান্তি দাও ঈশ্বর !

কাঞ্চনের প্রবেশ।

আলেয়া। এসো কুমার ! এখন কোথায় যেতে চাও ?

কাঞ্চন। সোনারগাঁয়ে।

আলেয়া। গিয়ে লাভ ? তুমি নিরস্ত্র—অসহায় ; অতবড় প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে কি করবে তুমি কুমার ?

কাঞ্চন। কি করবো বলতে পারছি না। দেহে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে এ অন্যায়ের প্রতিরোধ করবো, তারপর মরতে যদি হয়, সোনাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।

আলেয়া। তার চেয়ে তুমি শ্রীপুরে ফিরে যাও কুমার!

কাঞ্চন। কেমন করে ফিরবো বালক? গিয়ে কি বলবো? তারা যে আমার আশাপথ চেয়ে বসে আছে। না—তা হয় না; দেহে এখনও অনেক শক্তি আছে, চেষ্টা করলে হয় তো সোনাকে উদ্ধার করতে পারি।

আলেয়া। তবে চল, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

কাঞ্চন। তুমি যাবে? এসো অযাচিত বান্ধব! এসো দীনের বন্ধু! তুমি আমার অনেক করেছ; শত্রুর কবল থেকে তুমিই আমায় রক্ষা করেছ। আমি অচেতন হয়ে স্রোতের বেগে ভেসে যাচ্ছিলুম, তোমারই দয়ায় তীরে উঠেছি। তুমি কে জানি না, বোধহয় পূর্বজন্মে তুমি আমার ভাই ছিলে। বন্ধু! শ্রীপুরে যে কখনও ফিরে যাবো, এমন আশা করি না। যদি যাই—যদি দিন পাই, তোমার এ উপকার ভুলবো না।

আলেয়া। এখনও তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছো না; কি করে যে যাবে তাই ভাবছি।

কাঞ্চন। আমার কথা ভেবেই অধীর হচ্ছো বন্ধু! আমার বোনটির অবস্থা যদি দেখতে, তোমার প্রাণটা হাহাকার করে কেঁদে উঠতো। একাদশীর নিরম্বু উপবাসের মধ্যে বেরিয়ে গেছে, বোধহয় এখনও জলস্পর্শ করেনি; তার উপর ঈশা খাঁর নির্যাতন—ওঃ! ঈশা খাঁ—পাষণ্ড—

**স্বর্ণময়ীর প্রবেশ।**

স্বর্ণময়ী। কে গো, কে ঈশা খাঁকে পাষণ্ড বলছো? একি! দাদা—

কাঞ্চন। সোনা—সোনা! বোনটি আমার! কোথা থেকে, এলি? কেমন করে এলি? ঈশা খাঁ বাধা দিলে না?

স্বর্ণময়ী। না দাদা, সসম্মানে ফিরিয়ে দিলে।

আলেয়া। [স্বগত] ভগবান! তুমি আছ—তুমি আছ!

কাঞ্চন। ঈশা খাঁ! তোমার তিন তিনটে দুর্গ হস্তগত করেছি আমরা—তোমার অসংখ্য প্রজা, অগণিত অনুচর আমাদের হাতে প্রাণ দিয়েছে, এতখানি শত্রুতার চরম প্রতিশোধ নিয়েছ তুমি আজ সোনাকে ফিরিয়ে দিয়ে। আয় সোনা—আয়, এই প্রশান্ত সন্ধ্যায় আমরা ভাই-বোনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ঈশা খাঁর মঙ্গল হোক।

স্বর্ণময়ী। ঈশা খাঁর মঙ্গল হোক।

আলেয়া। এইবার তবে আমার পরিচয় গ্রহণ কর কুমার! যে ঈশা খাঁকে নিয়ে তোমাদের এত অশান্তি—এত হাহাকার, সে আমারই সহোদর।

কাঞ্চন ও স্বর্ণময়ী। সহোদর?

কাঞ্চন। তুমি ঈশা খাঁর ভাই? কেমন করে তুমি আমার উপর এমন সদয় হলে বন্ধু? আমি যে তোমাদের অসংখ্য পরিজনকে নিশীথ রাত্রে পুড়িয়ে মেরেছি!

আলেয়া। আমি যদি কেদার রায়ের ছেলে হতুম, আমিও বোধ-হয় এই করতুম; আর এতে যদি তোমার অপরাধ হয়ে থাকে, তার বিচার করবেন ঈশ্বর, আমি নই।

কাঞ্চন। ওরে মুসলমান! যদি সব মুসলমান এমনি হতো, তা হলে এ জাতির পায়ে বিশ্বজগত মাথা নত করতো।

আলেয়া। তুমি সোনা? আহা, বড় দুঃখ পেয়েছ বোন! চল, আমি নিজে তোমায় সঙ্গে করে শ্রীপুরে দিয়ে আসছি। তোমার পিতা

যদি আমার ভাইকে দণ্ড দিতে চান, সে দণ্ড আমি মাথা পেতে নেবো। এসো বোন! তুমি মাঝখানে থাক, আগে পিছে আমরা দুই ভাই আছি; জগতের কোন শত্রু তোমার ছায়াও স্পর্শও করবে না।

গীতকণ্ঠে মাঝির প্রবেশ।

মাঝি।— **গীত**

ও মন-মাঝি রে, ভর দরিয়ার নৌকা রাখা দায়।
কেমনে দিব পাড়ি তুফান ভারি ভাঙা নৌকা ডুবে যায়।

মাঝি। হাঁদে করতা? লৌকা চাই?

কাঞ্চন। নৌকা আছে তোমার? বেশ—বেশ, তাই চল। কি গাইছিলে মাঝি, গাও তো!

মাঝি। [ একটু হাসিয়া আবার গান ধরিল ]

**পূর্ব গীতাংশ**

কলকলিয়ে উঠছে পানি, কাঁপছে আমার পরাণখানি,
চাঁদ ডুবেছে, তারাগুলো মিটির মিটির চায়।
না-যাওয়া পথ অনেক বাকি, এনেছি যা কেবল ফাঁকি,
পাতাল থেকে ডাকছে বে যম, আয় রে চলে আয়।
রইলো কোথায় ছাওয়াল জরু, পাতার কুঁড়ে ছাগল গরু,
ডাক দিলে কেউ শোনে না রে প্রাণ গেল দরিয়ায়।

স্বর্ণময়ী। থামো মাঝি—থামো, তোমার গান শুনে মনটা আমার বড় কেঁদে কেঁদে উঠছে; মনে হচ্ছে, যা হারিয়েছে, বুঝি আর পাবো না। কোটিশ্বর! তুমি আমার আছ তো? এই যে আমার অন্তরের মাঝখানে বাঁশী বাজাচ্ছো। বাজাও—বাঁশী বাজাও—

মাঝি। আহেন করতা, আহেন— [ সকলের প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

দেবলের গৃহ

কোটিশ্বরের দারুমূর্তি বক্ষে লইয়া দেবলের প্রবেশ।

দেবল। [ মূর্তি স্থাপন করিয়া ] বোস এইখানে, তারপর দেখাচ্ছি মজা! ব্যাটাচ্ছেলে! সাতপুরুষ ধরে রাজভোগ খেয়ে আসছো, আর একটা উপকার করতে পার না? উল্টে সোনার মাথাটা খেয়ে বসে আছ! ওরে হারামজাদা কাঠের কুঁদো, সে যে তোর পায়ে জল না দিয়ে জল খেতো না রে! তার এই ফল? রসো! গিন্নী—গিন্নী—

নেপথ্যে জগদম্বা। কেন গা?

দেবল। একটা কুড়ুল নিয়ে এসো তো শীগগির—

কুঠারহস্তে জগদম্বার প্রবেশ।

জগদম্বা। এই নাও—[ কুঠার প্রদান ] হ্যাঁ গা, এত রাত্রে কুড়ুল কি হবে?

দেবল। এই কাঠের কুঁদোটা চ্যালা করবো—[ কাপড় বাগাইতে লাগিল ]

জগদম্বা। [ বিগ্রহ দেখিয়া ] ও মা, এ কে গো? আহা-হা, কেমন হাসছে দেখ!

দেবল। সরে যাও! এটাকে চ্যালা করবো, দিব্বি ভাত রাঁধা হবে।

জগদম্বা। মিনসের মাথা খারাপ হয়েছে না কি?

দেবল। বল হারামজাদা! সোনাকে ফিরিয়ে দিবি কি না! হাসলে চলবে না! আজ এসপার কি ওসপার, যা থাকে কপালে

বল, সোনাকে ফিরিয়ে দিবি কি না? দিবিনে তো? তবে আজ তোরই একদিনই কি আমারই একদিন—[ কুঠার উত্তোলন ]

জগদম্বা। [ বাধা দিয়া ] মর হতচ্ছাড়া মিনসে। এমন সুন্দর পুতুলটি, তাকে চ্যালা করে ভাত রাঁধবি?

দেবল। আলবৎ রাঁধবো, আমার খুসী। সরে যা বলছি, নইলে তোকেই চ্যালা করবো।

জগদম্বা। কেন, ও কি করেছে?

দেবল। কি না করেছে? চাঁদ রায় এত করে ব্যাটাকে পূজো দিচ্ছে, আর তারই মেয়ের সর্বনাশ করলে?

জগদম্বা। ও মা, এ কার মূর্তি গো? এ কি রাজবাড়ির কোটিশ্বর?

দেবল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ওরই নাম কোটিশ্বর।

জগদম্বা। [ বিগ্রহের সম্মুখে নতজানু হইয়া ] ঠাকুর—ঠাকুর! কি এমন পুণ্যি করেছি যে, তুমি আজ আমার ঘরে! আমার যে কিছু নেই; কি দিয়ে তোমার পূজো করবো? ওগো, দেখ তো—দেখ তো, বাগানে দুটো ফুল পাও যদি—

দেবল। মর মাগী! একটা কাঠের কুঁদো, তাকে ফুল দিয়ে পূজো করবি? অনেক পূজো করে দেখেছি; ওর চোখ নেই—কান নেই—ও কিছুই করতে পারে না।

জগদম্বা। ওগো, দেখ—দেখ, দেখতে দেখতে কুঁড়েঘরটা কোঠা-বাড়ি হয়ে গেল যে?

দেবল। এ্যাঁ—তাই তো। আমার কুঁড়েঘর? ওকি, শীতকালে শুকনো গাছে পদ্মফুল! শালা ভেল্কিবাজ! আমায় কোঠাবাড়ি দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে? চাইনে আমি কোঠাবাড়ি—চাইনে আমি পদ্ম-ফুল, আমি সোনাকে চাই। বল, সোনাকে ফিরিয়ে দিবি কি না?

জগদম্বা। মিনসে কি ডাকাত গো! রাজবাড়ির বিগ্রহ চুরি করে আনলে! এখন উপায়? ওরে মিনসে, কাল সকালে যে গর্দান যাবে—

দেবল। যায় যাক, তবুও ওকে আমি একবার দেখবো।

জগদম্বা। আরে, রাতারাতি ফিরিয়ে দিয়ে আয় মিনসে! এ কি সোজা দেবতা! দেখছিস না, ঘরে পা দিয়েছে আর কুঁড়েঘর কোঠাবাড়ি হয়ে গেছে। শীগগির যা—শীগগির যা মিনসে!

দেবল। হবে না, ওকে আমি চ্যালা করবোই।

জগদম্বা। খবরদার মিনসে! ওর গায়ে একটা কাঁটার আঁচড় যদি লাগে, তোর মাথাটা আমি চিবিয়ে খাবো।

দেবল। আরে, আমার মাথা তো গেছেই, ওর মাথাটাও আমি দু'ফাঁক করে দেবো।

জগদম্বা। মার দেখি হতচ্ছাড়া মিনসে! এই আমি ওকে জড়িয়ে ধরলুম, দেখি কে ওর কি করতে পারে।

দেবল তবে তুইসুদ্ধ মর—[ কুঠার উত্তোলন ]

গীতকণ্ঠে জনৈক রাখালবালকের প্রবেশ।

রাখালবালক।— **গীত**

মারিসনে রে—মারিসনে রে পাবি রে তোর রতন ফিরে।
ডুবাসনে তোর সোনার তরী অভিমানে দুঃখ-নীরে।

দেবল। বেরো ডিংরে!

রাখালবালক।—

**পূর্ব গীতাংশ**

ওই আঁখিতে নামে যদি একটু অশ্রুজল,
কেঁদে কেঁদে হবে সারা বিশ্ব ধরাতল,

ওরে পাগল, ও অভাগা, মুছবে রে তোর মনের দাগা,
তোর আকুল ডাকে অকূল বয়ে ভিড়লো নদী সিন্ধুনীরে।

রাখালবালক। ওগো—ওগো, তোমাদের রাজা আসছে যে! দেখবে এসো—দেখবে এসো।

[ প্রস্থান।

দেবল। ছাড়ো—ছাড়ো! ওরে, রাজা আসছে যে! এসে দেখবে, সোনা নাই। রাজা মরবে, রাণী মরবে, সব কেঁদে কেঁদে মরে যাবে; তবুও ও সর্বনেশেকে রাজভোগ খাওয়াতে হবে? না—না, ও যেখানে থাকবে, সেখানকার মাটিসুদ্ধ জ্বলে যাবে। ফেলে দে—ফেলে দে বলছি। আমি ওকে চ্যালা করবো—

জগদম্বা। এই—এই মিনসে! খবরদার—

[ বিগ্রহ লইয়া প্রস্থান, পশ্চাতে উদ্যত কুঠারহস্তে দেবলের প্রস্থান।

———

## ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

ভবানী।

ভবানী। সোনা! সোনা! আয়—ফিরে আয়! মাগো, আর যে সইতে পারিনে মা! কোটিশ্বর! নিষ্ঠুর! শেষে এই করলে! আমার এতটুকু সুখ তোমার সইলো না? একটা বিধবা মেয়ে—বিয়ের পর ছ' মাস স্বামীর ঘর করলে না—পক্ষিশাবকের মত বুকে করে রেখেছিলুম, তাকেও ছিনিয়ে নিলে! সে যে তোমার পূজা না দিয়ে কোনদিন

জলগ্রহণ করতো না। রাজা এলে কি বলবো আমি? কেমন করে তার চোখের জল নিবারণ করবো? বলে দাও—বলে দাও নিষ্ঠুর!

চম্পকের প্রবেশ।

চম্পক। মা—

ভবানী। চুপ—চুপ! কেউ তোরা মা বলে ডাকিসনি আমায়। সব শত্রু—সব শত্রু! ওঃ, এতবড় বংশ—এমন জগৎ-জোড়া সুনাম, একটা মেয়ের জন্য সব গেল! ছেলেটা কোথায় গিয়ে বেঘোরে প্রাণ দিলে, কে জানে?

চম্পক। কোটিশ্বরকে কোথায় লুকিয়েছ মা?

ভবানী। কি?

চম্পক। শুনতে পাচ্ছো না? কোটিশ্বর যে মন্দিরে নেই—

ভবানী। নেই? বলিস কি চম্পক?

কেশার মার প্রবেশ।

কেশার মা। হ্যাঁ গা বৌমা, কোটিশ্বর কই?

ভবানী। মা—

কেশার মা। মর আবাগের বেটি, হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকালে কি হবে? বলি, ঠাকুর কই? মন্দির খালি পড়ে আছে যে! তুমি কি বাছা তাকে ফেলে দিয়েছ?

ভবানী। কোটিশ্বরকে ফেলে দেবো? সপ্ত পুরুষের বিগ্রহ—কত সুখের অংশভাগী, কত দুঃখের সাথী—কত সাগর মন্থন করা সে মাণিক! চলে গেছে—সুখের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে চলে গেছে। মা! ভাঙন যখন ধরে, চারিদিক দিয়েই তার আগমনীর সাড়া পড়ে

যায়। কেউ থাকবে না আর! আমি বুঝতে পারছি মা, এ বাতি দিতে একটা প্রাণীও থাকবে না! বিশ্বাসঘাতক! শেষে গেলে? কেন নিষ্ঠুর! সোনার হাতে ফুল জল না পেলে কি তোমার তৃপ্তি হয় না?

কেশার মা। হাত্তোর গুষ্টির নিকুচি করেছে! বলি খুঁজতে হ বে না এসব ঢং করলেই চলবে!

ভবানী। কাকে খুঁজবে মা? কোথায় খুঁজবে? সে জন্মের মত চলে গেছে। এসো তিনজনে মিলে আর্তনাদ করি—কেঁদে প্রাসাদটা ভাসিয়ে দিই, নইলে বুক ফেটে যাবে—মাথাটা ধড় ছেড়ে ছুটে পালাবে। কাঁদ চম্পক—কাঁদ, একটু শীতল হই—

চম্পক।—

### গীত

আমি কাঁদিব জীবনভোর।
আঁখিজলে মোর ধরণী ধোয়াব, যদি নাহি মিলে চিতচোর।
আমার এ হৃদয়-মন্দিরে তার পা দুখানি যদি নাহি পশে আর,
আঘাতে আঘাতে ভাঙিয়া ফেলিব অসার এ হৃদয় মোর।
কাননে কাননে মরুপ্রান্তরে গৃহে গৃহে আর সাগরে অম্বরে,
খুঁজিব রে আমি যত দিনে চোখে নামিবে আঁধার ঘোর।

[ প্রস্থান।

চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের প্রবেশ।

চাঁদ। রাণী—রাণী—

ভবানী। মহারাজ—[ চাঁদ রায়ের পায়ে আছড়াইয়া পড়িলেন ] তোমার সোনাকে ডালি দিয়েছি!

চাঁদ। সোনা—সোনা, আমার সোনা? দুঃখের সান্ত্বনা—রোগের

ঔষধ—নিরানন্দ পুরীর কলকণ্ঠ বিহঙ্গম নেই ? কোটিশ্বর ! এতই কি পাপ করেছিলুম যে আমার নিষ্কলঙ্ক বংশে এমনি করে কলঙ্ক লেপন করলে ?

কেশার মা। হ্যাঁ বাবা চাঁদ ! একটা মেয়ের জন্য সগুষ্ঠি কেঁদে কেঁদে মরে যাবে ? দুঃখ নেই কার ? তা বলে এমনি করে হাত পা ভেঙে বসে থাকতে হবে ? তার চেয়ে ছুটে যাও ; যেমন করে হোক তাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসো।

কেদার। হ্যাঁ—ছিনিয়ে নিয়ে আসবো দাদা ! কেন তুমি আমায় বাধা দিচ্ছ ? আদেশ দাও—আদেশ দাও, আমি সোনার অন্বেষণে যাই—

চাঁদ। কোথায় পাবে তাকে কেদার ? সোনারগাঁ তন্ন-তন্ন করলেও তাকে খুঁজে পাবে না।

কেদার। না পাই, গোটা সোনারগাঁ তুলে নিয়ে এসে কালীগঙ্গার জলে ফেলে দেবো। দাদা ! দাদা ! আদেশ দাও, আমি যাই— [ প্রস্থানোদ্যত ]

চাঁদ। কেদার ! ফিরে এসো, যেতে হবে না ; দেখি, কোটিশ্বর কি করেন।

ভবানী। হায় মহারাজ, তোমার কোটিশ্বর মন্দির ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

কেদার। কি, কোটিশ্বর পালিয়ে গেছেন ?

চাঁদ। যাবে—সব যাবে কেদার ! আমি জানি, বর্ষার কূলে কূলে ভাঙন ধরেছে। বিনা দোষে গুরুত্যাগ করেছি কেদার ! সে কি বৃথা যাবে ভেবেছ ? ভাই—ভাই ! সোনাকে হারিয়েও আমি খাড়া থাকতে পারতুম, কিন্তু কোটিশ্বরকে হারিয়ে কি নিয়ে বাঁচবো ? ফিরে এসো কোটিশ্বর ! যাক সোনা, তুমি এসে আমার বুকটা জুড়ে বসে থাকো।

[ প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী ও কাঞ্চনের প্রবেশ।

স্বর্ণময়ী। মা—মা—

কেদার, ভবানী ও কেশার মা। সোনা?

কেদার। [ স্বর্ণময়ীর মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া ] কেমন আছিস মা? কেমন আছিস মা আমার? [ মস্তক চুম্বন ]

কেশার মা। চাঁদ! ও চাঁদ! ওরে, আমি কাকে ডাকি? কেউ একবার শাঁখ-ঘণ্টা বাজায় না? সত্যি ফিরে এলি দিদি? আমার যে পেত্যয় হচ্ছে না রে? ওরে, আমার বরাতে এত সুখ ছিল?

কাঞ্চন। থাম বুড়ি!

ভবানী। এ কি স্বপ্ন, না সত্য? সোনা! এদিকে আয় তো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—

কেদার। না—না, কোন কথা নয়; সরে যাও সব! কেন মা, মুখখানা এমন মলিন? চক্ষু কোটরে ঢুকেছে, কেশপাশ ধূলি ধূসরিত? দু'দিনে এমন বিষাদের ছবি নিয়ে কোথা থেকে এলি মা? কেউ কোন কটু কথা বলেছে?

চাঁদ রায়ের প্রবেশ।

চাঁদ। কে ফিরে এসেছে?

কেশার মা। সোনা—সোনা, ওই দেখ, মুখখানা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ও বৌমা! চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাছা? মেয়েটাকে কিছু খেতে দাও না! আচ্ছা, আয় দিদি! আমার সঙ্গে আয় তো! আয়—আয়, শীগগির আয়— [ সোনাকে লইয়া প্রস্থান।

চাঁদ। কোথা থেকে আসছে সোনা?

কাঞ্চন। আমি বলছি মহারাজ! শ্রীমন্ত সোনাকে ঈশা খাঁর রাজ-প্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিল; মহানুভব ঈশা খাঁ ওকে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছে, একটা কটু কথা বলেনি—ভুলেও একবার স্পর্শ করেনি।

কেদার। তাহলেও সে অপরাধী।

আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। সে অপরাধের জন্য তার হয়ে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি মহারাজ! ক্ষমা করুন। ঈশা খাঁ আমার ভাই, যদি মহানুভব চাঁদ রায়ের হাতে তার দণ্ডই প্রাপ্য হয়, সে দণ্ড আমাকে দিন—[নতজানু]

কেদার। ঈশা খাঁর ভাই তুমি?

কেশার মার প্রবেশ।

কেশার মা। বুকের পাটা তো খুব!

ভবানী। ওঠো বাবা, ওঠো!

চাঁদ। দণ্ড দেবো বালক? বটে—বটে! এমন কি দণ্ড আছে, যা ঈশা খাঁর পক্ষে যথেষ্ট? বালক! তুমি মুসলমান; হিন্দুর বুকের ব্যথা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। জান, তোমরা কি করেছ? আমার বংশে যে কলঙ্কের বোঝা তোমরা চাপিয়ে দিয়েছ, অমন সহস্র সোনাকে ফিরিয়ে দিলেও তার লাঘব হবে না। যে মুহূর্তে আমার কন্যা ঈশা খাঁর প্রাসাদে প্রবেশ করেছে—তার দেওয়া খাদ্য পানীয় গ্রহণ করেছে, সেই মুহূর্তেই সে আমার পর হয়ে গেছে।

কাঞ্চন, কেদার ও ভবানী। মহারাজ—

চাঁদ। নিয়ে যা কাঞ্চন, নিয়ে যা; অপহৃতা কন্যাকে চাঁদ রায় গ্রহণ করে না।

কেদার। দাদা—দাদা! দোহাই তোমার, একবার সোনার মুখের দিকে চাও। নিজের অন্তরের মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে দেখ, তারপর দিও এ কঠিন আদেশ।

চাঁদ। কেদার! আমার কন্যাকে আমি চিনি না? চাঁদ রায়ের কন্যা মরবে, তবু কলঙ্কিনী হবে না।

ভবানী। তবু তাকে গ্রহণ করা চলবে না?

চাঁদ। না।

ভবানী। তবে আমাকে আগে হত্যা কর, তারপর সোনাকে বিদায় দিও।

চাঁদ। আমি সবাইকে ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু হিন্দুধর্মের অমর্যাদা করতে পারি না।

আলেয়া। বুঝলুম না হিন্দু, তোমার ধর্মের মর্যাদা। যে ধর্মের জন্য একটা অবলা নারীকে অকারণ বিসর্জন দিতে হয়, সে ধর্ম কখনই ভগবানের সৃষ্ট নয়—সে ধর্ম মানুষের হাতে গড়া। তোমার অবস্থা যদি আমার হতো রাজা, আমি বরং ঈশা খাঁর উপর প্রতিশোধ নিতুম, তবু কন্যার গায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও দিতুম না।

কাঞ্চন। মহারাজ—

চাঁদ। আমি কোন কথা শুনবো না কাঞ্চন! আমার এই শেষ কথা, অপহৃতা কন্যাকে আমি গ্রহণ করবো না।

কেদার। দাদা! নিজের জন্য আমি তোমার কাছে অনুরোধ করিনি। তোমার কন্যার জন্য তোমার পায়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি; মহারাজ! দয়া কর—

ভবানী। রাজা! রাজা! এত অনুনয়ে ভগবানের আসন টলে যায়, তোমার প্রাণটা কি একটুও টলবে না?

চাঁদ। ধর্মের সঙ্গে ছলনা! দোহাই তোমাদের, আমায় অনুরোধ করো না, রাখতে পারবো না। আমার একই কথা—সোনা আমার কেউ নয়।

স্বর্ণময়ীর প্রবেশ, পশ্চাতে চম্পক।

স্বর্ণময়ী। সোনা তোমার কেউ নয়? বাবা—

ভবানী। এদিকে আয়—এই বুকে, ওদিকে নয়—ও মরুভূমি, জলে যাবি। আয় তো—আয় তো মা, আমরা মা আর মেয়ে দুজনে মিলে আকাশটা ফাটিয়ে একবার আর্তনাদ করি, দেখি, ভগবান কতক্ষণ তার সিংহাসনে স্থির হয়ে বসে থাকেন।

কেদার। ওঃ, সোনা! অভাগী! কেন তুই ফিরে এলি? কেন কালীগঙ্গায় ঝাঁপ দিলিনি? তোকে যে আর আমরা বেঁধে রাখতে পারবো না মা! বুঝতে পারছি তুই নিষ্পাপ, তবু এ প্রাসাদে তোর আর স্থান হবে না! উঃ—মহারাজ! আমাকেও ত্যাগ কর, এ যে আমি সইতে পারছি না।

স্বর্ণময়ী। বাবা!

কেশার মা। এও তুমি সইতে পারছো চাঁদ? এমন পাষাণ তুমি? ওঃ—কেন তোমায় ছেলেবেলায় কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলুম, কেন গলা টিপে মারিনি?

কাঞ্চন। আয় তবে বোন, দুঃখ করিসনে। কার জন্য কাঁদিস অভাগী? এসব শত্রু। আয় দিদি, আয়! জগৎ-সংসার তোকে পায়ে ঠেলে দিলেও আমি তোকে ত্যাগ করবো না। এসো বোন, শৈশবে দুজনে মিলে যেমন করে খেলাঘর সাজিয়ে সংসার পেতেছিলুম, আজ আবার তেমনি করে আমরা নতুন সংসার রচনা করবো।

স্বর্ণময়ী। বাবা! আমি মেয়ে বলেই আমার উপর এ অবিচার করলে, যদি আমি ছেলে হতুম, তাহলে আজ আমায় আদরে বুকে তুলে নিতে। বাবা! আমি স্বামী চিনলুম না—সংসার চিনলুম না, আজীবন তোমাদের আশ্রয় করেই বেড়ে উঠেছি, আজ বিনাদোষে আমার সে আশ্রয় চূর্ণ করলে? যাক, কোন অভিযোগ নেই আমার, তোমার চরণ স্পর্শ করবো না, দূর থেকেই তোমাদের প্রণাম করে যাচ্ছি। কাকা! বাবাকে দেখো। মা—মা—মাগো! যাই মা, বিদায়—

চম্পক। দিদি—দিদি—

কাঞ্চন। খবরদার! সরে যা বলছি; আমাদের জাত গেছে, স্পর্শ করিসনে।

চম্পক। দিদি—

কাঞ্চন। দূর হ—[ গলাধাক্কা দিয়া চম্পককে চাঁদ রায়ের কোলে ফেলিয়া দিল ] আয় সোনা—

[ উভয়ের প্রস্থান।

কেশার মা। সোনা—সোনা—

[ প্রস্থান।

ভবানী। কোটিশ্বর! কোটিশ্বর! শেষে এই করলে? মৃত্যু দাও—আমায় মৃত্যু দাও নিষ্ঠুর!

[ প্রস্থান।

কেদার। দাদা! কি আর বলবো তোমায়? আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি, একদিন তোমার এই নিষ্ঠুরতার জন্য যেন তোমায় হাহাকার করে কাঁদতে হয়, এই সোনাকে ফিরে পাবার জন্য তোমার অন্তরাত্মা যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

চাঁদ। অভিশাপ দে—জগৎসুদ্ধ সবাই আমায় অভিশাপ দে, তবু

আমি টলবো না। চম্পক! বাবা! সবাই যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তুই আমায় ত্যাগ করিসনে।

আলেয়া। মহারাজ চাঁদ রায়! আমি এসেছিলুম ক্ষমা চাইতে; কিন্তু যা দেখলুম, আর আমি ক্ষমা চাই না রাজা! ঈশা খাঁর প্রাপ্য দণ্ড আমায় দাও, মৃত্যুদণ্ড হলেও আমি তা হাসতে হাসতে বরণ করবো।

কেদার। দণ্ড দেবো বালক! ঈশা খাঁর জন্য আমাদের সোনার সংসার শ্মশান হয়েছে; এর চরম প্রতিশোধ নেবো। এসো—আপাতত তুমি এই রাজপ্রাসাদে বন্দী। আসুক ঈশা খাঁ তোমার অন্বেষণে, তারপর—তারপর—

চাঁদ। কেদার! এ ভাই—

কেদার। ভাইয়ের অপরাধে ভাইয়ের দণ্ড হবে না? তবে তোমার এ অপরাধে আমার এ বুকটা কেন ভেঙে গেল দাদা?

[ নেপথ্যে কামান-গর্জন ]

সকলে। ও কি!

[ পুনঃ কামান-গর্জন ]

চাঁদ। এত কাছে শত্রু-সৈন্য? ঈশা খাঁ! এইবার—এইবার—

[ প্রস্থান।

কেদার। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!

[ প্রস্থান।

আলেয়া। ভাই! ভাই! এ আবার কি লীলা তোমার?

[ প্রস্থান।

———

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

সোনারগাঁ—প্রাসাদ

শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত। হলো না—হলো না, প্রতিশোধ নেওয়া হলো না। খোকা! তোর তৃষিত আত্মার তৃপ্তিসাধন করতে পারলুম না। অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! একদিন এই ব্রাহ্মণ চাঁদ রায় কেদার রায়ের মাথার মণি ছিল, তাদের সহস্র শ্রদ্ধার দান এই দীন ব্রাহ্মণ পায়ে ঠেলে চলে গেছে। আজ সে বিধর্মীর প্রাসাদে বন্দী; তার মর্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে, তার অগ্নিদৃষ্টিতে একটা শুষ্ক পত্রও দগ্ধ হয় না।

গীতকণ্ঠে বাঈজীগণের প্রবেশ।

বাঈজীগণ।—

গীত

দিন গেছে তোর পাগলা হাতী।
আপন ফাঁদে পড়লি বাঁধা, (এবার) চামচিকেও মারবে লাথি
পরকে বিষ দিয়ে তুই তুলে নিলি দুধের বাটি,
সহসা কম্পজ্বরে লেগেছে দাঁতকপাটি;
ছাই দিতে পরের মুখে, বাজ পড়েছে নিজের বুকে,
চোখে তোর ঘনিয়ে এলো চেয়ে দেখ আঁধার রাতি।

১ম বাঈজী। এসো বঁধু, একটু মদ খাবে?

শ্রীমন্ত। দূর হও—দূর হও নরকের কৃমিকীট!

১ম বাঈজী। ওঃ—চোরের বড় গলা যে! ঘরের মেয়ে পরকে দিতে দোষ নেই, যত দোষ মদ খেলে, না? আমরা নরকের কৃমিকীট, আর তুমি বড় সাধু! ফুঃ— [ বাঈজীগণের প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। [ বুক চাপড়াইয়া ] তুমি আছ? আছ তুমি ব্রহ্মণ্যদেব? একবার জ্বলে ওঠ দেখি, আগ্নেয়গিরির মত তরল অগ্নিনিঃস্রাবে এই প্রাসাদটাকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দাও!

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। কি ঠাকুর, আবার কার সর্বনাশের মতলব আটছো?

শ্রীমন্ত। সরে যাও; নইলে—

বান্দা। নইলে কি? ভস্ম করে ফেলবে? সে ক্ষমতা কি আর তোমার আছে ঠাকুর? ছিল একদিন, যখন তোমার মহত্বের পায়ে চাঁদ রায়ের মাথা লুণ্ঠিত হতো—যখন সহস্র প্রলোভন চারিদিক দিয়ে তোমায় আকর্ষণ করলেও তুমি পাহাড়ের মত খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে। করলে কি ঠাকুর? এ দেশের হিন্দু মুসলমান তোমাকে যে দেবতার মত ভক্তি করতো, ক্ষণিকের উত্তেজনায় এমন উচ্চাসন তোমার নিজের হাতে চূর্ণ করলে?

শ্রীমন্ত। ক্ষণিকের উত্তেজনা? জান, চাঁদ রায় আমার কি করেছে? বিনা দোষে আমায় গুরুর আসন থেকে ভিক্ষুকের ধূলিশয্যায় নামিয়ে দিয়েছে, তার রাজ্যে আমার রোগা ছেলের জন্য এক মুষ্টি অন্ন জোটেনি—এক ফোঁটা ওষুধ মেলেনি! তারই প্ররোচনায় আমার ছেলেটা তিলে তিলে শুকিয়ে মরেছে—

বান্দা। তুমি তার ছেলের গলা টিপে মারলে না কেন? তার মেয়েটাকে বিষ খাওয়ালে না কেন? এর জন্য অসহায় নারীর উপর অত্যাচার?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ—নারীর উপর অত্যাচার! চাঁদ রায়কে তুমি চেনো না মুসলমান! তার যদি একশোটা ছেলে থাকতো, আর সবাই যদি আমার হাতে প্রাণ দিত, সে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়াতো। এ জগতে তার সবার চেয়ে প্রিয় সমাজ, তার প্রাণপাখী • এই সমাজের পিঞ্জরে আবদ্ধ; তাই তার মেয়েকে এনে তার বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়েছি।

বান্দা। চাঁদ রায়ের মেয়ে তোমার মেয়ে নয়? এত ভেদজ্ঞান যদি তোমার, কোন স্পর্ধায় গুরু হয়েছিলে?

শ্রীমন্ত। বান্দা—

বান্দা। কথা কয়ো না ঠাকুর! তোমার সৃষ্টিকর্তার ভুলে তুমি বামুন হয়ে জন্মেছ, আমরা সেই ভুল সংশোধন করবো।

শ্রীমন্ত। কি করবে?

বান্দা। তোমায় মুসলমান করবো।

শ্রীমন্ত। কি? কি বললে?

বান্দা। ঠিকই বলছি, জাত তোমাব গেছেই; তুমি যখন ঘরের মেয়েকে মুসলমানের হাতে তুলে দিতে চাও, তখন হিন্দুত্ব আর তোমার মধ্যে নেই। পৈতেটা তো নিজেই ফেলে দিয়েছ, বাকীটুকু আমরাই করে দিচ্ছি, দাঁড়াও।

শ্রীমন্ত। একটা তুচ্ছ বান্দার এখনও এত স্পর্ধা হয়নি যে, ব্রাহ্মণের ধর্ম নষ্ট করে।

বান্দা। ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাকে শুধু হিন্দুরাই শ্রদ্ধা করে

না, মুসলমানও তার কাছে মাথা নত করে। কিন্তু তুমি তো ব্রাহ্মণ নও, তুমি চণ্ডাল!

শ্রীমন্ত। সাবধান কুক্কুর!

বান্দা। সাবধান ভণ্ড!

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। সোনা কই—সোনা?

বান্দা। কে তুই?

শ্রীমন্ত। কেশা?

কেশরী। আজ আর কেশা নই, কেশরী সিংহ। বল ঠাকুর, সোনা কোথায়?

শ্রীমন্ত। এখানে নেই।

কেশরী। মিথ্যা কথা! ঠাকুর, আমার সঙ্গে চালাকি করো না বলছি। আমি বন-জঙ্গল মাড়িয়ে নদী-নালা সাঁতার কেটে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছি। কোন বাধা আমি মানবো না, সোনাকে আমি নিয়ে যাবোই; তাতে যদি তোমার মত দু'দশটা মানুষের মাথা ছিঁড়ে ফেলতে হয়, তাতেও আমি কসুর করবো না।

শ্রীমন্ত। যাও—যাও, বিরক্ত করো না; আমি এখন অন্য কথা ভাবছি।

কেশরী। ভাবছো তো, কেমন করে সোনার ধর্মটা ঈশা খাঁর পায়ে ডালি দিয়ে নিজের জন্য ইমারত গড়বে? ভাবছো তো, এই খবরটা যখন চাঁদ রায়ের কাছে পৌঁছুবে, কেমন করে তার পাঁজরভাঙা কান্নায় বনের পাখী কেঁদে উঠবে? ওরে বামুন! একদিন যার নুন খেয়েছ, তার এই সর্বনাশ করতে হাত উঠলো তোমার? না—তুমি

বামুন নও, বামুনের ঘরে তোমার জন্ম হয়নি; তোমার মা বোধ হয় তোমাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে পালন করেছিল!

শ্রীমন্ত। স্তব্ধ হও শূদ্র!

কেশরী। শূদ্র আমি, না তুমি? যার নুন খেয়েছি, তার গায়ে একটা কাঁটার আঁচড় দিতেও আমার হাত ওঠে না ঠাকুর! আর তুমি—বোধ হয় তোমার মেয়ে থাকলে তাকেও ঈশা খাঁর পায়ে ঢালি দিতে। যাক, তোমার ব্যবস্থা পরে হবে, এখন সোনাকে পাবো কিনা বল?

শ্রীমন্ত। না, পাবে না।

কেশরী। পাবো না? তবে আগে তোমার মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিই, তারপর—[ যষ্টি উত্তোলন ]

বান্দা। থামো, সত্যই চাঁদ রায়ের কন্যা এখানে নেই, জাঁহাপনা তাকে সসম্মানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কেশরী। তুমি কে?

বান্দা। আমি জাঁহাপনার গোলামের গোলাম।

কেশরী। তোমার জাঁহাপনা কোথায়?

বান্দা। তিনি শ্রীপুর যাত্রা করেছেন।

কেশরী। কারণ?

বান্দা। যুদ্ধ।

কেশরী। সোনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যুদ্ধ?

বান্দা। কেন নয়? সোনার সঙ্গে তার শত্রুতা নেই সত্য, কিন্তু চাঁদ রায়ের সঙ্গে শত্রুতা তো মেটেনি হিন্দু!

কেশরী। শুনছো—শুনছো বামুন? শত্রুতা করতে হয় তো এমনি মুখোমুখি—পুরুষে পুরুষে। পুরুষের সঙ্গে না পেরে যারা তোমাদের

মত মেয়েদের নিয়ে টানাটানি করে, তারা বামুন হলেও শূদ্রের অধম। মুসলমান! সহস্র ধন্যবাদ তোমার প্রভুকে, লক্ষ নমস্কার তোমার ধর্মকে। কিন্তু তোমাকে আমি ছাড়বো না বামুন! তোমার চুলের মুঠি ধরে রাজার কাছে নিয়ে যাবো।

শ্রীমন্ত। শূদ্রের এখনও এত ক্ষমতা হয়নি যে, ব্রাহ্মণের গায়ে হস্তক্ষেপ করে।

বান্দা। শূদ্রের ক্ষমতা না থাকে, মুসলমানের আছে। শোন ঠাকুর! তুমি এখন আমার মুঠোর মধ্যে। আমি ইচ্ছা করলে আজীবন তোমায় কারারুদ্ধ করে রাখতে পারি; ইচ্ছা করলে তোমায় মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত করতে পারি, কিন্তু তা করবো না। তুমি এমন ভীষণ যে, তুমি মুসলমান হলে মুসলমান ধর্মটাই বিষাক্ত হয়ে উঠবে, আর তোমার উপযুক্ত কারাগারও এ রাজ্যে নেই। আমি তোমায় মুক্তি দেবো; কিন্তু তার পূর্বে তোমার ওই ভয়ঙ্কর চোখ দুটো উপড়ে নেবো, যাতে কোনদিন কারো সর্বনাশ করতে না পার।

শ্রীমন্ত। কি বললে? আমার চোখ উপড়ে নেবে? এসো, এগিয়ে এসো, দেখি আমার গায়ে একটা কাঁটার আঁচড় দেবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার হাত দুটো দগ্ধ হয়ে যায় কি না!

বান্দা। ভাল, পরীক্ষাই হোক তবে—[ শ্রীমন্তকে ধরিতে অগ্রসর হইল ]

কেশরী। [ মধ্যে দাঁড়াইয়া ] খবরদার! শত্রু আমাদের, শাস্তি দিতে হয় আমরা দেবো, তুমি চোখ রাঙাবার কে?

বান্দা। বন্দী আমাদের; মুক্তি দিতে হয় আমরা দেবো, তুমি কথা বলবার কে?

কেশরী। আমি পাগলা হাতী।

বান্দা। আমি বুনো বাঘ।

কেশরী। নিজের মাংস ছিঁড়ে খাও। মনে করেছে, আমার সামনে তুমি এই বামুনের উপর অত্যাচার করবে? তা হয় না মুসলমান! সত্য এ আমাদের পরম শত্রু, তা হলেও একদিন এ আমাদের গুরু ছিল, এর পায়ে গোটা রাজ্যটা মাথা নোয়াতো। তোমার হাতে এর অপমান আমি সইবো না। চোখ উপড়ে নিতে হয়, আমরা নেবো; গলা টিপে মারতে হয়, আমরা মারবো। তুমি পর—তুমি শত্রু, তোমার সাহায্য নিয়ে ঘরের শত্রুকে দমন করবো না। চাঁদ রায় সহস্র দুঃখে জর্জরিত হলেও চাঁদ রায়।

শ্রীমন্ত। আর এই ব্রাহ্মণ এই দুর্দিনেও ব্রাহ্মণ। [ প্রস্থান।

বান্দা। এই দর্পেই হিন্দু রসাতলে গেল। অসহায় আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করবে তোমরা, তবু পরের সাহায্য নেবে না। গৃহশত্রুর হাতে ঘরের মেয়ের লাঞ্ছনা তোমরা সইতে পার, তবু পরে তাকে স্পর্শ করলে তোমাদের জাত যায়। মনে করেছ কি হিন্দু, এই ব্রাহ্মণ এইখানেই নিরস্ত হবে? না—সে সোনাকে হয় তো আবার নির্যাতন করবে।

কেশরী। চাঁদ রায়ের কবল থেকে টেনে এনে?

বান্দা। চাঁদ রায়ের আশ্রয়ে সে আর নেই হিন্দু! চাঁদ রায় অপহৃতা কন্যাকে গ্রহণ করেননি!

কেশরী। সে কি? সোনা তাহলে এখন—

বান্দা। পথে পথে বিচরণ করছে, অরক্ষিত—অসহায়—[ প্রস্থান।

কেশরী। মহারাজ চাঁদ রায়! তুমি এমন নিষ্ঠুর? অসার সমাজের জন্য অভাগা মেয়েকে ডালি দিলে? [ প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রীপুর-রাজপ্রাসাদ—মন্দির-সম্মুখ

চাঁদ রায় একাকী।

[ চাঁদ রায়ের সে সুগঠিত দেহ আর নেই, জরা আসিয়া সে দেহের সবটুকু লাবণ্য হরণ করিয়া লইয়াছে ; চক্ষু কোটরগত, মুখে কালিমা, ললাটে চিন্তার রেখা ]

চাঁদ। আসছে—আসছে, ধীর পদক্ষেপে মৃত্যু এগিয়ে আসছে। এসো বন্ধু! এসো দয়াল! এসো সর্বসন্তাপহারী যম! আমি বাহু বাড়িয়েছি, আমায় আলিঙ্গন কর। আস্তে—আস্তে। এত জোরে পা ফেলো না বন্ধু! আমার সোনা অনেক কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়েছে, ডুকরে কেঁদে উঠবে। ওহো-হো, আমার সোনা—আমার কোটিশ্বর—

ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। রাজা! রাজা! এ কি, আবার তুমি বেরিয়ে এসেছ? নাঃ—আর তোমায় বাঁচাতে পারলুম না।

চাঁদ। চুপ—চুপ! সোনা ঘুমুচ্ছে, জেগে উঠবে।

ভবানী। আবার সোনা, আবার কোটিশ্বর? এসো—এসো—

চাঁদ। আরে দূর, টানে দেখ না! বসো, আমি একটা মতলব ঠাউরেছি। সোনার সঙ্গে কোটিশ্বরের বিয়ে দেবো, তাহলে আর সোনা বিধবা হবে না, আর কেউ তাকে চুরি করে নিয়ে পালাতে পারবে না।

ভবানী। ওঃ—কোটিশ্বর! এতখানি ভালবাসার কোন প্রতিদান দিলে না ঠাকুর? অভিমানে পালিয়ে গেলে? [ চাঁদ রায়ের প্রতি ] কোটিশ্বরকে দেখবে?

চাঁদ। এ্যাঁ! কই—কই, কই আমার কোটিশ্বর?

ভবানী। যদি দেখতে পাও, আর পাগল হবে না? বল; তা হলে যেখান থেকে পারি, কোটিশ্বরকে এনে দেবো।

চাঁদ। দাও—এনে দাও। না, আমি পাগল হবো না। কোটিশ্বর, আমায় পাগল করো। কই—কই কোটিশ্বর?

গীতকণ্ঠে চম্পকের প্রবেশ।

চম্পক।—

গীত

পালিয়ে গেছে নিঠুর কালা আঁধার করে বৃন্দাবনে।
মিছে তারে খুঁজে ফেরে খেলার সাথী বনে বনে॥
বাজে না আর মোহন বেণু, চরে না আর গোঠে ধেনু,
যমুনা আর বয় না উজান পাগল করা বাঁশীর সনে॥
আয় রে ফিরে আয় রে কালা, শুকিয়ে গেল ফুলের মালা,
কেঁদে কেঁদে অমানিশা নামলো যে হায় দু'নয়নে॥

চাঁদ। কে গা? তুমি কে? তুমি কি আমার কোটিশ্বর?

চম্পক। জ্যাঠামশায়! [ কাঁদিয়া ফেলিল ]

ভবানী। কাঁদিসনে বাবা, কাঁদিসনে। এখনও যে অনেক দেখতে হবে—অনেক সইতে হবে, এই তো সবে আরম্ভ; এতবড় বংশ দশের চক্ষে আজ কলঙ্কিত, এমন সপ্তপুরুষের বিগ্রহ অকারণে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, বাংলার গৌরব-মুকুট—যার নামে গোটা দেশটা সসম্ভ্রমে শির নত করে, তার আজ এই অবস্থা! বাইরে শত্রু মুহুর্মুহুঃ

হুঙ্কার দিচ্ছে, তবু নির্বিকার! সৈন্য নেই—রসদ নেই—নগর জুড়ে অভাবের আর্তনাদ। কোথায় দাঁড়িয়ে আছিস, জানিস না বালক! সব যাবে—কেউ থাকবে না। কাঁদবার অনেক সময় পাবি চম্পক! যদি পারিস, কোটিশ্বরকে সন্ধান করে নিয়ে আয়, এই মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তর্বেদনা একটু শীতল হোক।

চম্পক। কোথা থেকে আনবো মা?

ভবানী। জানি না, তুই পুরুষ, একথা আমায় জিজ্ঞাসা করছিস? সন্ধান কর—আকুলস্বরে ডাক; যেখান থেকে হোক—যেমন করে হোক, আনতে পারবিনে বাবা?

চম্পক। পারবো। হ্যাঁ মা, তাহলে জ্যাঠামশায় ভাল হবে? আচ্ছা, আমি তবে যাই মা। কোটিশ্বরকে না নিয়ে আমি ফিরবো না।

ভবানী। চম্পক! না—থাক, সোনা গেছে, কাঞ্চন গেছে, তুই আমার কাছে থাক, নইলে বুকটা ফেটে যাবে। আয়—কাছে আয়—

চম্পক। না মা, আমি কোটিশ্বরকে না এনে আর তোমার কোলে উঠবো না।

[ প্রস্থান।

ভবানী। চম্পক—চম্পক—

চাঁদ। চুপ—চুপ, সোনা ঘুমুচ্ছে—

ভবানী। ওমা, আমার কি হলো? আমার বুকটা এমন করে উঠলো কেন? ভগবান! সব ছিনিয়ে নিলে—সব ছিনিয়ে নিলে।

কেদার রায়ের প্রবেশ।

কেদার। মহারাজ!

চাঁদ। কে, কেদার? সমাজটা এমন মানুষের বুকের উপর পাহাড়ের

মত চেপে বসে থাকে কেন কেদার? টেনে সরিয়ে দিতে পারিস? নিশ্বাস ফেলতে পারিনি যে! উঃ—উঃ, আমার সোনা—আমার কোটিশ্বর—

কেদার। দাদা! যদি অনুমতি কর, সোনাকে ফিরিয়ে আনি—

চাঁদ। না-না-না, ওই দেখ, সমাজটা কটমট করে তাকাচ্ছে; কি ভীষণ ওর চোখ দুটো! পালিয়ে আয় কেদার—পালিয়ে আয়—

[ প্রস্থান।

কেদার। মহারাণী! অনুমতি দাও, সোনাকে ফিরিয়ে আনি—

ভবানী। না।

কেদার। না? এখনও তুমি আমায় অনুমতি দেবে না? দেখছো রাজার অবস্থা? সোনা যদি না আসে, রাজাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

ভবানী। জানি, তবু তার ফেরা হবে না।

কেদার। স্বামীর মরামুখ দেখবে, তবু সমাজের মোহ ঘুচবে না? কেন তুমি এমন পাষাণ হলে মহারাণী?

ভবানী। আমি যে সহধর্মিনী; পাপ-পুণ্য জানি না, স্বামীর বিধানই আমার ধর্ম।

কেদার। থাকো তুমি তোমার ধর্ম নিয়ে, আমি যেমন করে হোক, সোনাকে ফিরিয়ে আনবো। অমন সহস্র সমাজের চেয়ে আমার ভাই অনেক বড়! আমি চললুম মহারাণী—

ভবানী। তার পূর্বে আমাদের বিদায় দিয়ে যাও, স্বামীর বিধান যেখানে পদদলিত, সে গৃহ আমার জন্য নয়।

কেদার। ওঃ—এই নারীই সংসারে যত অনর্থের মূল। তবে আর কি? বৈধব্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকো। সাবধান! তখন যদি এক

ফোঁটা চোখের জল পড়ে, আমি অভিশাপ দেবো ; রসনা যদি আর্তনাদ করে, কণ্ঠে বিষ ঢেলে দেবো। রাজা! তোমায় বাঁচতে দিলে না তোমারই সহধর্মিনী।

কেশার মার প্রবেশ।

কেশার মা। ও কেদার! শীগগির আয়, মুখপোড়ারা রাজবাড়ি ঘিরেছে যে!

কেদার। কি? কি? কারা?

কেশার মা। ওই ঈশা খাঁর সৈন্য।

কেদার। রাজপ্রাসাদ বেষ্টন করেছে? বল কি মা! আমাদের সৈন্যগুলো কি সব মরেছে?

আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। মরেনি, তবে তাদের মরাই ভাল ছিল। সবাই মিলে তারা শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে।

কেদার। ওঃ, রাজা—রাজা! তোমার চোখে আজ আর অগ্নি-বৃষ্টি হয় না—তোমার কণ্ঠ আর সিংহের মত হুঙ্কার দেয় না, তাই আজ সব শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালই হয়েছে—তুমি উন্মাদ হয়েছ, নইলে এই বিশ্বাসঘাতকতা তুমি সহ্য করতে পারতে না। মা! আমায় দেখিয়ে দিতে পার, কোনদিকে আছে তারা? আমি তাদের অস্ত্র ধরতে শিখিয়েছি, একবার তাদের সামনে গিয়ে আমি দাঁড়াবো, দেখি কেমন করে তারা আমার কাঁধের উপর তরবারি তোলে!

কেশার মা। না—না কেদার! ওদের সামনে গিয়ে তোমায় আমি দাঁড়াতে দেবো না। কাঞ্চন গেছে, সোনা গেছে, চাঁদও যাবার পথে ;

তার উপর তোমাকে আর আমি যমের মুখে এগিয়ে দিতে পারবো না। তার চেয়ে আমায় একটা লাঠি দে, ফটক খুলে বাইরে গিয়ে দেখি, কে কত বড় বীর!

আলেয়া। তুমি যাবে?

কেশার মা। যাবো না? আমার চোখের উপর দু' দুটো ছেলে শত্রুর হাতে প্রাণ দেবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দেখবো? ভাবিসনে কেদার! আমার এই বুড়ো হাড়ে এখনও এমন শক্তি আছে যে, ঈশা খাঁর মত চারটে মরদকে আমি এক লাঠিতেই শুইয়ে দেবো। আর যদি মরি, বুড়ো মানুষ, দুঃখ করিসনে, হাড় কখানা টেনে কালীগঙ্গার জলে ফেলে দিস।

কেদার। মা! যাদের হাত ধরে শিখিয়েছি, তারা আজ আমার পর; আর তুমি এই জীর্ণ দেহটা দিয়ে আমায় ঘিরে রাখতে চাও?

কেশার মা। আমি যে মা!

ভবানী। সত্যই তুমি মা, এতখানি স্নেহ গর্ভধারিণী মায়েরও বুঝি থাকে না।

কেদার। কিন্তু তোমাকে তো যেতে দেবো না মা! তুমি চাঁদ রায় কেদার রায়ের ধাত্রী—তাদের মা। তারা বেঁচে থাকতে তুমি কেন শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াবে? না—তা হবে না। জানি, সবাই মরবে, তবু আমি যতক্ষণ আছি, একটু নিশ্বাস ফেলে নাও; তারপর কে কোথায় থাকবে বলতে পারি না। জয় মহারাজ চাঁদ রায়ের জয়—জয় মহারাজ চাঁদ রায়ের জয়! [ প্রস্থানোদ্যত ]

আলেয়া। একটা কথা, আমি কি এমনি করেই প্রাসাদে রুদ্ধ হয়ে থাকবো—আমার উপর কি কারও কোন আদেশ নেই? হয় মুক্তি, না হয় দণ্ড?

কেদার। ঠিক বলেছ, তোমার একটা কিছু করে যেতে হবে। মা! কি করবো বল তো?

কেশার মা। কি করবি, তা আমায় বলে দিতে হবে? এ ঈশা খাঁর ভাই নয়? সেই ঈশা খাঁ, যে তোমাদের সুখের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! গলা টিপে মার, না হয় জ্যান্ত পুতে ফেল।

কেদার। না, অতটা নৃশংস মৃত্যু তোমায় দেবো না। তবে মুক্তি তোমায় দেবো বালক! এমন মুক্তি, যার পরে আর বন্ধন থাকে না। ঈশা খাঁর চোখের উপরে তোমায় প্রাসাদের চূড়ায় দাঁড় করিয়ে তোমার মাথাটা দেহচ্যুত করে ঈশা খাঁর সামনে ফেলে দেবো। আমরা তো মরেইছি, ঈশা খাঁরও বুকটা ভেঙে চৌচির করে দিয়ে যাবো।

আলেয়া। তাই কর হিন্দু! আমার মৃত্যুতে ঈশা খাঁর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হোক।

কেদার। এসো তবে বালক, মুক্তি নেবে এসো—

ভবানী। না—আমি যেতে দেবো না। আমার বুকে যতই দুঃখ জমা থাক, যত অপরাধই করুক ঈশা খাঁ, এই নিষ্পাপ বালককে আমি কিছুতেই হত্যা করতে দেবো না। আয় তো বাবা—আয় তো, দেখি কে আমার বুক থেকে তোকে ছিনিয়ে নেয়? ঈশা খাঁ আমার শত্রু হলেও তুমি আমার পরম বান্ধব।

আলেয়া। মহারাণী! আমার মা নেই, আজ হতে তুমিই আমার মা—[ জড়াইয়া ধরিল ]

ভবানী। জয় করেছি—জয় করেছি। কেদার! ঈশা খাঁকে ডাকো, দেখে যাক সে, তার সব শত্রুতার কণ্ঠরোধ করে দিয়েছি।

কেদার। এ উচ্ছ্বাসের সময় নয় মহারাণী! বাইরে অসংখ্য শত্রু, আমরা নিঃসহায়—সৈন্য নেই, রসদ নেই; ঈশা খাঁর বাহু ভেঙে দেবার

এই একমাত্র সুযোগ। সে আমাদের সর্বস্বান্ত করেছে, প্রতারণায় আমার সৈন্যদের আয়ত্ত করেছে, কিসের মিত্রতা তার সঙ্গে?

কেশার মা। ছাড়ো বৌমা। আয় ছোঁড়—আয়—[ আলেয়ার কেশাকর্ষণ করিলে, আলেয়ার স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িল ]

সকলে। এ কি!

ভবানী। কে তুমি?

আলেয়া। ছিলুম ঈশা খাঁর বোন, এখন তোমার কন্যা। মা! আমি তোমার সোনা।

ভবানী। আঃ, এমনি ছিল সে।

কেশার মা। গলে গেলি কেদার?

কেদার। মা! হিন্দু-মুসলমানের এমন তীর্থ দেখেছ? দেখ—দেখ, বিষাদের ঘন মেঘে কি বিদ্যুতের রেখা, দুঃখের মরুভূমিতে কি শান্তির প্রস্রবণ! এই তো জয়! কে বলে আমরা নিঃস্ব? এতবড় জয় ঈশা খাঁ স্বপ্নেও দেখেনি।

আলেয়া। আমায় হত্যা করবে না বীর?

কেদার। না মা, ভুল বলেছি, তুমি তো শত্রু নও; তুমি অতিথি—হিন্দুর নারায়ণ। এসো মা, এসো হিন্দুর জাগ্রত দেবতা, মরার পূর্বে চোখের জলে তোমায় অভ্যর্থনা করে যাচ্ছি। যেদিন এই প্রাসাদের সঙ্গে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে, সেদিন তোমার ভাইকে গিয়ে বলো—হিন্দু এমনি ছিল। [ কেশার মার প্রতি ] এসো মা, তোরণদ্বারে আমি কামান নিয়ে থাকবো, তুমি থাকবে অন্দরের দ্বারে।

আলেয়া। আর আমি রইলুম প্রাসাদের চূড়ায়; যাও বীর, নির্ভয়!

কেদার। জয় চাঁদ রায়ের জয়! জয় চাঁদ রায়ের জয়!

[ প্রস্থান।

নেপথ্যে। আল্লা—আল্লা—আল্লা হো—

ভবানী। এসো মা—

[ আলেয়া সহ প্রস্থান।

কেশার মা। হাত্তোর গুষ্ঠির পিণ্ডি !

[ প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

শ্রীপুর—প্রাসাদসম্মুখ

চম্পকের প্রবেশ।

চম্পক। কোটিশ্বর! কোটিশ্বর! কই তুমি কোটিশ্বর? ফিরে এসো; তোমায় না পেলে জ্যাঠামশায় যে বাচবে না। আমি যে মাকে বলে এসেছি, তোমায় নিয়ে ফিরে যাবো। এত ডাকছি, তবু তুমি ফিরে আসবে না? তবে আর আমি ফিরবো না, এইখানে অনাহারে অনিদ্রায় শুকিয়ে মরবো।

### গীত

আর খেলিতে পারি না একা।
চরণ স্মরণে জীবন দানিব, যদি নাহি পাই দেখা॥
আকুল আমার আবাহনে, যদি আসন নাইকো টলে,
আপনারে মোর সাগর সজিয়া ডুবিয়া মরিব জলে,
কলঙ্ক তোমার ভরিবে ধরণী, কেহ ডাকিবে না ওগো গুণমণি,
মুছে যাবে তব ধরাবুক হতে দয়াল নামের রেখা॥

কোটিশ্বরকে লইয়া গীতকণ্ঠে রাখালবালকের
প্রবেশ।

রাখালবালক।—

**গীত**

ধূলো ঝেড়ে বুকে নে রে খেলার সাথী এলো ফিরে।
অভিমানে ফেরাসনে মুখ, ভাসিসনে আর অশ্রুনীরে॥

চম্পক। এই তো—এই তো কোটিশ্বর! কোথায় পেলে তুমি ভাই?

রাখালবালক।— **পূর্ব গীতাংশ**

অবহেলায় নদীর কূলে কাঁদছিল সে আপন ভুলে,
পথের যত ধূলো কাদা লেগেছে ওর কালো চুলে,
যা নিয়ে যা আপন ঘরে, বিরহে ওর অশ্রু ঝরে,
ধুয়ে দে ওর গায়ের মাটি আপনারি বক্ষ চিরে॥

[ কোটিশ্বরকে দিয়া প্রস্থান।

চম্পক। কেন পালিয়েছিলে দুষ্টু? না খেয়ে মরছিলে তো? ধরে খুব মেড়িয়েছে? খুব করেছে। যেমন পাজী তুমি, তেমনি সাজা পেয়েছ। এলে কেন? কে পায়ে ধরে সেধেছিল? ওঃ, আবার চোখ ছলছল করছে! দিই ফেলে? দিই? না-না, ফেলবো না—ফেলবো না, চল—ঘরে যাই! একি, কারা ও কালো কালো মানুষ রাজবাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে? তাই তো, কি করে ভেতরে যাই! উপায় কর—উপায় কর কোটিশ্বর!

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। কে তুমি বালক, কোটিশ্বরকে ডাকছো? কে, চম্পক? কেদার রায়ের ছেলে? খোকা—খোকা! পেয়েছি—

চম্পক। গুরুদেব!

শ্রীমন্ত। চুপ! কে কার গুরুদেব! তোরা শিকার—আমি ব্যাধ, তোদের সঙ্গে আমার খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক। বলি, তোর হাতে ও কি?

চম্পক। কোটিশ্বর।

শ্রীমন্ত। এঁ্যা—কোটিশ্বরের বিগ্রহ! সেই কোটিশ্বর, যে আমায় স্বর্গে তুলে দিয়ে নরকের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে, আমায় সোনার সিংহাসনে বসিয়ে আজ বৃক্ষতলে দাঁড় করিয়েছে? কত নিশীথের স্বপ্ন, কত দিবসের চিন্তা আমার ওই দারুমূর্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ও আমার দুর্জয় শত্রু! আমি ওকে টুকরো টুকরো করে ধূলোয় মিশিয়ে দেবো। দে—দে, তোদের ওই স্বার্থপর দেবতার মাথাটা আমি গুঁড়ো করি ফেলি—

চম্পক। না-না-না, আমি কিছুতেই দেবো না। কোটিশ্বরের শোকে জ্যাঠামশায় পাগল হয়েছে, ওকে না পেলে কেঁদে কেঁদে মরে যাবে।

শ্রীমন্ত। মরুক, তার মরাই আমি চাই।

চম্পক। কেন পাষাণ, কেন? তুমি আমার দিদিকে ঘরছাড়া করেছ—দাদাকে পর করে দিয়েছ—জ্যাঠামশায়কে পাগল করে তুলেছ, তার উপর আবার তার মৃত্যু চাও? গিয়ে দেখে এসো তার অবস্থা, চোখ ফেটে রক্ত বেরুবে। এত দুঃখ দিয়েও তোমার শান্তি হবে না?

শ্রীমন্ত। না হবে না; আমার অভাগা ছেলেটা যে পথে গেছে, তোদের সবাইকে সে পথে ঠেলে দিতে না পারলে আমার শান্তি হবে না।

চম্পক। কেন? আমরা কি তোমার কাছে এতই অপরাধ করেছি? তুমিই কি সারাজীবন আমাদের দু'হাত ভরে দিয়েছ, আমরা কি তোমার কিছুই করিনি?

শ্রীমন্ত। চম্পক!

চম্পক। সরে যাও—সরে যাও, তোমার নিশ্বাসে কোটিশ্বরের মুখখানা শুকিয়ে গেছে।

শ্রীমন্ত। আমার ছেলেটা যখন না খেয়ে মরে গেল, তখন তো ওর মুখটা শুকিয়ে যায়নি। অথচ আমি সারাজীবন ওর পায়ে ফুল জল দিয়েছি। দে—দে, আমি ওর মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলুম, আমি আজ ওকে চূর্ণ করবো

চম্পক। না—না, দোহাই তোমার! আমাকে মার, ওর গায়ে হাত দিও না—[ শ্রীমন্ত তাহার হাত হইতে বিগ্রহ ছিনাইয়া লইল ] উঃ, ভণ্ড—পশু—জল্লাদ—

শ্রীমন্ত। বটে, আমি জল্লাদ? তবে তোকেই আগে শেষ করি আয়—[ চম্পকের মস্তকে দারুমূর্তি দ্বারা আঘাত করিল ]

চম্পক। উঃ, মাগো—[ পড়িয়া গেল ও মাথা ফাটিয়া রক্তের ধারা বহিতে লাগিল ]

শ্রীমন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! খোকা! তৃপ্ত হ!

চম্পক। গুরু! আমায় মেরেছ—মেরেছ, কোটিশ্বরের অপমান করো না; তাকে রাজবাড়িতে পৌছে দিও! আমি মার কাছে শপথ করে এসেছিলুম, হলো না—হলো না—

শ্রীমন্ত। চম্পক!

চম্পক। কি করলে গুরু? আমার মরার খবর যে মুহূর্তে রাজ-বাড়িতে পৌঁছাবে, সেই মুহূর্তে তোমার মাথা নিতে দেশে দেশে লোক ছুটবে; কেউ তোমায় বাঁচাতে পাববে না। উঃ—মাগো, মা আমার! জন্ম-জন্মান্তরের আরাধ্যা দেবী! বিদায়—বিদায়! কোটিশ্বর! আমি যাই, তোমার মান তুমি রেখো—[ মৃত্যু ]

শ্রীমন্ত। প্রতিশোধ—চূড়ান্ত প্রতিশোধ! কেদার রায়! এইবার দেখবো তুমি কতবড় বীর! হ্যাঁ, এইবার তোমার পালা কোটিশ্বর—

কুঠারহস্তে দেবলের প্রবেশ।

দেবল। কই কোটিশ্বর? চ্যালা করবো, চ্যা—একি, দাদা? তুমি এখানে? শ্রীপুরে আসতে সাহস হলো? বুকের পাটা তো খুব!

শ্রীমন্ত। যাও—যাও, বিরক্ত করো না মূর্খ!

দেবল। সত্যি দাদা, আমি মূর্খ, তোমার মত পশু নই।

শ্রীমন্ত। কি? কি বললি?

দেবল। আমি কি একা বলছি? রাজ্যিশুদ্ধ্ সবাই এ কথা বলছে। করলে কি দাদা? বামুনের মুখ পুড়িয়ে দিলে! আমি তো মুখ্যু, তোমাকে দাদা বলে ডাকতে আমারও লজ্জা হচ্ছে।

শ্রীমন্ত। ডাকিস না—ডাকিস না, যা—

দেবল। যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার মাথাটা গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যাই।

শ্রীমন্ত। দে—সাধ্য থাকে দে!

দেবল। সাধ্য ছিল, বাধা দিচ্ছে শুধু ওই "ভাই" সম্বোধনটা।

শ্রীমন্ত। ভুলে যা ও সম্বন্ধ।

দেবল। তুমি ভুলে যেতে পার। তুমি যখন এমন চাঁদ রায়েরই শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছ, তখন আমাকে ভুলবে, সে আর বেশী কি? কিন্তু আমি ভুলতে পারছি না যে, তুমি আমার জ্ঞাতি। লোক যতবারই তোমায় গালাগালি দেয়, ততবারই আমার বুকটা ভেঙে যায়। দাদা—

শ্রীমন্ত। চুপ, কথা বলিসনে, তাহলে তোকেও ওই চম্পকের পথে যেতে হবে।

দেবল। কে—কে ও? চম্পক? এ্যাঁ! এ যে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। কি হয়েছে যাদু? কেন গোপাল, এমন ধুলোয় শুয়ে আছ?

ওঠ—ওঠ! এ কি, এ যে অসাড়—নিশ্বাস পড়ছে না! আহা-হা, কে মারলে তোমায় মাণিক?

শ্রীমন্ত। আমি।

দেবল। তুমি? দাদা! সত্যি তুমি এই শিশুকে মেরে ফেলেছ? কেন? ও তোমার পায়ে কি দোষ করেছিল?

শ্রীমন্ত। আমার ছেলে কেদার রায়ের কাছে কি দোষ করেছিল?

দেবল। তোমার ছেলে আর কেদার রায়ের ছেলেতে অনেক তফাৎ। তোমার ছেলের মত ছাগলছানা লাখে লাখে জন্মায়, কিন্তু এ যে আর হবে না দাদা!

শ্রীমন্ত। তবে আর কি? বুক চাপড়ে কাঁদ, চাঁদ রায় কেদার রায়ের পায়ের ধুলো অঙ্গে মেখে বিশ্বময় তাদের গুণগান করে বেড়াও!

দেবল। তাই যাবো; কিন্তু তার আগে এ পাপের শাস্তি দিয়ে যাবো। তুমি ওর মাথাটা যেমন করে ভেঙেছ, তোমার মাথাটা আমি তেমনি করে ভাঙবো—[ কুঠার উত্তোলন ]

শ্রীমন্ত। যা—যা, রাজবংশের পদলেহন করগে যা। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! হাঃ-হাঃ-হাঃ! [ প্রস্থান।

দেবল। ওঃ, বামুনের ঘরে এমন পশুও জন্মায়! ওঠ যাদু—ওঠ মাণিক! ঘর ছেড়ে কেন রাস্তার ধূলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছ ধন? এসো—এসো, আমার ভাই তোমার মাথা ভেঙে রক্তের নদী বইয়েছে, আমি চোখের জলে সে রক্ত ধুইয়ে দিই। [ মৃতদেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইল] ওরে আকাশ! একটু জল ঢেলে দে, এত রক্ত যে চোখের জলে ধুয়ে না। ওরে, কে তোরা ডাকাতের দল! পথ ছেড়ে দে—হাতের অস্ত্র ছুঁড়ে ফেল; কেদার রায়ের ছেলে মরেছে, আজ পৃথিবীর ভূমিকম্প—

[ প্রস্থান।

ঈশা খাঁ ও এনায়েতের প্রবেশ।

ঈশা খাঁ। শুনেছ এনায়েত, বাহার আমার বেগম হতে এসেছিল ?

এনায়েত। কেন ?

ঈশা খাঁ। বড় সুন্দরী কিনা, গরীব খসমকে আর পছন্দ হচ্ছে না।

এনায়েত। তারপর ?

ঈশা খাঁ। আমি তার সৌন্দর্যটা একটু কমিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। তার সুন্দর নাকটা একটু ছোট করে দিয়েছি। কি বল, এবার বোধহয় সে স্বামীর ঘর করতে পারবে ? কিন্তু এত গোলা কোথা থেকে আসছে ? তাই তো এনায়েত ! শ্রীপুরের সমস্ত সৈন্য আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, প্রাসাদে যোদ্ধা নেই, তবু তারা মুহুর্মুহুঃ গোলাবর্ষণ করছে ? চাঁদ রায় কেদার রায় কি সমস্ত প্রাসাদটা জুড়ে বসে আছে ? ওঃ—এই সাতদিনে আমি আমার অর্ধেক সৈন্য হারিয়েছি। কোথায় কাঞ্চন, কোথায় আলেয়া ?

এনায়েত। কাঞ্চন প্রাসাদে নেই।

ঈশা খাঁ। নেই ? বল কি এনায়েত ? তাহলে রাজপ্রাসাদ সমভূমি করলে আলেয়াকে ফিরে পাবো না ? কোথায় গেছে তারা, বলতে পার ?

এনায়েত। না।

ঈশা খাঁ। একথা আমায় এতদিন বলনি কেন ?

এনায়েত। বললে তুমি হয় তো আর অগ্রসর হতে না।

ঈশা খাঁ। আলেয়া আগে, না যুদ্ধ আগে ? কি ফল আমার সৈন্যক্ষয় করে, যদি আলেয়াকেই ফিরে না পাই ?

এনায়েত। প্রতিশোধ নেবে না হিন্দুর ওপর ?

ঈশা খাঁ। কেন বল তো এনায়েত, হিন্দুর ওপর তোমার এ বিদ্বেষ ?

এনায়েত। কেন, তুমি তা বুঝবে না ঈশা খাঁ ! এই হিন্দুসমাজ

আমার জীবনটা বিষময় করেছে। আমি একদিন হিন্দু ছিলাম, আমার ধমনীতে এখনও রাজপুতের রক্ত বইছে!

ঈশা খাঁ। [ সবিস্ময়ে ] রাজপুত? হিন্দু? বল কি এনায়েত? কোথায় তোমার জন্মভূমি?

এনায়েত। মিবার।

ঈশা খাঁ। মিবার? মিবারের রাজপুত তুমি—এখানে এইভাবে?

এনায়েত। হ্যাঁ ঈশা খাঁ! যার জন্য জীবনের মধুময় বসন্তে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার রঙিন গোলাপের দল শুকিয়ে ঝরে পড়েছে, আমার সেই নিরুদ্দিষ্টা স্ত্রীকে খুঁজতে খুঁজতে বাংলায় এসে পড়েছি।

ঈশা খাঁ। এনায়েত, তুমি কি—তুমি কি তবে, কি নাম ছিল তোমার?

এনায়েত। জয়সিংহ।

ঈশা খাঁ। জয়সিংহ? তোমার স্ত্রীর নাম সত্যবতী না?

এনায়েত। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাকে জান? কোথায় সে, কোথায় সত্যবতী?

ঈশা খাঁ। হারিয়ে ফেলেছি, খুঁজে নাও বন্ধু! তোমার স্ত্রী আমার ভগ্নী আলেয়া।

এনায়েত। খোদা! খোদা! তবে আমার চেষ্টা নিষ্ফল করনি! ঈশা খাঁ! এ কি আনন্দ—এ কি বেদনা, তোমার ভগ্নী আলেয়া আমার স্ত্রী? কাঞ্চন তবে আমারই ঘরে আগুন লাগিয়েছে? কি করবো—কি করবো ঈশা খাঁ?

ঈশা খাঁ। সন্ধান কর, বাছাই বাছাই সৈন্য চারিদিকে পাঠিয়ে দাও। যেখান থেকে হোক, আলেয়াকে খুঁজে আনা চাই; তাতে যদি কাঞ্চনকে হত্যা করতে হয়, তবু পশ্চাৎপদ হবে না।

এনায়েত। উত্তম, তবে তাই হোক। আলেয়াকে চাই—কাঞ্চনকে চাই—

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। কাঞ্চনকে চাই? আমি জানি তার সন্ধান।

ঈশা খাঁ। কে? শ্রীমন্ত?

এনায়েত। তুমি জান? তবে এসো তো ঠাকুর, তোমার সঙ্গে সৈন্য দিচ্ছি, তাদের শুধু দেখিয়ে দেবে—ব্যস! কাঞ্চন! কাঞ্চন! অপেক্ষা কর; এসো—এসো ঠাকুর!

ঈশা খাঁ। তোমার হাতে কি ঠাকুর?

শ্রীমন্ত। কোটিশ্বরের বিগ্রহ।

[ এনায়েতের প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। চাঁদ রায়ের কোটিশ্বর? চুরি করে এনেছ?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ ঈশা খাঁ, তোমার জন্য। এই বিগ্রহ সম্মুখে রেখে গোলাবর্ষণ কর, কেউ আর প্রতিরোধ করবে না।

ঈশা খাঁ। ঠাকুর! তুমি ঈশা খাঁকে চেন না। ঈশা খাঁ দাঁড়িয়ে মরবে, তবু ছলনায় যুদ্ধে জয় করবে না।

শ্রীমন্ত। ভেবে দেখ ঈশা খাঁ—

ঈশা খাঁ। তুমি না হিন্দু? তুমি না ব্রাহ্মণ? ওই বিগ্রহ তুমিই না পূজো করেছ? আমি মুসলমান, আমারই ইচ্ছে হচ্ছে তোমার হাত দুটো মুচড়ে ভেঙে দিয়ে ওই বিগ্রহ চাঁদ রায়ের কাছে পাঠিয়ে দিই, আর তুমি হিন্দুধর্মের রক্ষক হয়ে হিন্দুর বিগ্রহ নিয়ে এমনি ছিনিমিনি খেলছো?

শ্রীমন্ত। এ কাঠের পুতুল, এতে প্রাণ নেই ঈশা খাঁ!

ঈশা খাঁ। সে কথা বলবো আমি, তুমি কেন বলবে ঠাকুর? যাও—যাও, ফিরিয়ে নিয়ে যাও; আমার কাছে ওর কোন মূল্য নেই বটে, কিন্তু চাঁদ রায়ের কাছে ওই কাঠের পুতুল অমূল্য রত্ন। সে আমার অনেক

ক্ষতি করলেও আমার ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করেনি। আমিও তাঁর ধর্মকে সসম্ভ্রমে সেলাম করি।

শ্রীমন্ত। ভুল বুঝলে ঈশা খাঁ! এতে একদিনে জয়।

ঈশা খাঁ। চাই না জয়, পরাজয়ের কালিমা মুখে মেখে নিয়েই ফিরে যাবো, তবু অপরের ধর্মে আঘাত করবো না। ঠাকুর! তোমার মত ঘবভেদী বিভীষণ হিন্দুধর্মে আর কটা আছে বলতে পার? যে পাপ করেছ তুমি, তার ফলে সর্বাঙ্গে কুষ্ঠব্যাধির জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছে। আর কেন শ্রীমন্ত? ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও, পৃথিবী শীতল হোক—হিন্দুধর্ম নিকণ্টক হোক। [ প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। মূর্খ। [ কোটিশ্বরের বিগ্রহের প্রতি ] তা হলে আর তোমায় নিয়ে কি করবো? এইখানেই তোমার দেবলীলা শেষ হোক। [ আছাড় মারিতে উদ্যত হইল ]

গীতকণ্ঠে সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন।— **গীত**

এ যে অশেষ লীলার খনি।
বিষধর-বিষে জ্বলবি রে শুধু, নারিবি হরিতে মণি।
বাজের আঘাতে ভাঙে না ও, কভু মরে না অনলে জলে,
প্রলয়-আঁধারে ধ্বংসলীলায় ওই আঁখিদীপ জ্বলে,
নিয়ে আয় ওরে কুসুমের ভার, রাঙা পায়ে ওর দে রে উপহার,
সুশীতল হবে তাপিত এ দেশ, উঠিবে মঙ্গল ধ্বনি।

[ বিগ্রহ কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। এই—এই, খবরদার—

[ প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

### কৃষকপল্লী—কুটিরসম্মুখ

### স্বর্ণময়ী।

স্বর্ণময়ী। ছিলুম প্রাসাদে, এসেছি পর্ণকুটিরে। রাজভোগে যাদের তৃপ্তি হতো না, তাদের আহার্য আজ ভিক্ষালব্ধ ফলমূল; প্রতিবেশী বর্বর চাষা। অদৃষ্টে আরও কি আছে, কে জানে!

### গীতকণ্ঠে কৃষকবালকগণের প্রবেশ।

কৃষকবালকগণ।—

### গীত

ওরে চাচা, আপন বাঁচা।
বাগানে আগল দে রে, ছাগল এল, সামলে রাখ তোর পুঁইমাচা॥
ওদের মেয়েছেলের দাড়ী গজায়, পুরুষগুলো মাকুন্দ,
পুরুষের নাম কলমিলতা, মেয়ের নামটি মুকুন্দ,
সামাল সামাল আসছে তেড়ে, দল বেঁধে ওই ভেড়ের ভেড়ে,
যা পাবে তাই খাবে রে, পাকা হোক আর হন্দ কাঁচা।

স্বর্ণময়ী। তোরা আজ সকাল সকাল ফিরলি যে?

১ম বালক। আরে কি কথা কও দিদিমণি! ক্ষেতে কাজ করছি, কতকগুলো দুষমনের মত চেহারা হৈ-চৈ করে এসে এর নাম সুধোয়, ওর নাম সুধোয়। ওকে তো একটা তলোয়ারের খোঁচাই দিয়ে দিলে। আমাকে যদি কিছু বলতো, মারতুম শালাকে এক ঘুঁসি। যাক দিদিমণি, তুমি আর এখানে দাঁড়িও না, ঘরে যাও—ঘরে যাও।

[ বালকগণের প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। দাদা এখনও আসছে না কেন? সেই ভোর বেলা বেরিয়েছে, পেটে এখনও দানাটি পড়েনি। বোধহয় আজ ভিক্ষায় কিছু পায়নি, বুঝি কাউকে বলতে পারেনি—আমায় দুটি ভিক্ষা দাও। কোটিশ্বর! আমায় দুঃখ দিয়েছ, সেজন্য অভিযোগ করি না, কিন্তু রাজার ছেলেকে ভিক্ষুক সাজালে!

সহসা গুপ্ত সৈনিকগণের প্রবেশ।

স্বর্ণময়ী। কে তোমরা? কোথা থেকে আসছো?

১ম সৈনিক। আমরা সুলতান ঈশা খাঁর সৈনিক, আসছি আপাতত শ্রীপুর থেকে।

স্বর্ণময়ী। তা এখানে কি? কাকে চাও?

১ম সৈনিক। শাহজাদীকে।

স্বর্ণময়ী। কে শাহজাদী?

১ম সৈনিক। হুজুরাইন আমাদের সম্মুখে।

স্বর্ণময়ী। আমি? মিথ্যাকথা।

১ম সৈনিক। তবে আপনি কে?

স্বর্ণময়ী। আমি—আমি এক ভিখারিণী।

[ সৈন্যগণ পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিয়া হাসিয়া উঠিল ]

১ম সৈনিক। কেদার রায়ের পুত্রের সঙ্গে এক ভিখারিণী!

স্বর্ণময়ী। কেদার রায়ের পুত্র? কে সে?

১ম সৈনিক। কাঞ্চন রায়—এই ঘরের মধ্যে। এর পরও কি সুন্দরী বলতে চান যে তিনি শাহজাদী নন?

স্বর্ণময়ী। হ্যাঁ, এর পরও বলতে চাই, আমি শাহজাদী নই—তাকে আমি চিনি না—কখনও তার নামও শুনিনি।

১ম সৈনিক। তাহলে ক্ষমা করবেন হুজুরাইন! সুলতান ঈশা খাঁর আদেশে আপনাকেঃজোর করেই নিয়ে যেতে হবে। তাতে যদি প্রয়োজন হয়, কাঞ্চন রায়কে হত্যা করতেও আমরা কুণ্ঠিত হবো না।

স্বর্ণময়ী। ঈশা খাঁর আদেশে? যদি জানতুম তোমরা ঈশা খাঁর অনুচর, আমি দ্বিরুক্তি না করেই তোমাদের অনুসরণ করতুম। কিন্তু তা তো নয়; ঈশা খাঁর অনুচর এমন চোরের মত দুঃখিনীর কুটিরে হানা দেয় না। তোমরা বোধহয় সেই ব্রাহ্মণের গুপ্তচর!

১ম সৈনিক। ক্ষমা করবেন শাহজাদী! এত কথার সময় আমাদের নেই। আমরা আপনাকে নিয়ে যাবোই! স্বেচ্ছায় যান, সসম্মানে নিয়ে যাবো; আর যদি জোর করেন, হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতেও আমাদের বাধবে না।

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। আমার হাতে তরবারি থাকতে? [ স্বর্ণময়ীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল ]

১ম সৈনিক। হুঁশিয়ার হিন্দু! তুমি আমাদের যা করেছ, তোমার মাথাটা ছাতু করে মাটিতে মিশিয়ে দিলেও তার শোধ হয় না। তবু আপাতত আমরা তোমাকে রেহাই দিয়ে যাচ্ছি। আমরা এসেছি শাহজাদীকে নিয়ে যেতে। খবরদার! যদি বাধা দাও, আমরা জাঁহাপনার হুকুমের অপেক্ষা রাখবো না, তোমাকে এইখানেই শুইয়ে দিয়ে যাবো। এসো শাহজাদী—

কাঞ্চন। কে শাহজাদী? এ ভ্রান্ত ধারণা কে দিলে তোমাদের? আমার কুটিরে শাহজাদী আসবেন কি করে?

১ম সৈনিক। কি করে, তা তুমি জান লম্পট—

কাঞ্চন। অসভ্য বর্বর! সব বিসর্জন দিয়ে জগতের এক নিভৃত কোণে আশ্রয় নিয়েছি, এখানেও আমাদের উপব নির্যাতন? তোমরা কি মনে করেছ, সিংহ জালবদ্ধ বলে এতই দুর্বল যে, শৃগালের ভ্রূকুটি সহ্য করবে? এসো, আমাকে হত্যা না করে কেউ ওর কেশস্পর্শ করতে পারবে না।

[ সকলে মিলিয়া কাঞ্চনকে আক্রমণ করিল ]

স্বর্ণময়ী। দাদা! ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও; আমি যাই ওদের সঙ্গে, দেখি অদৃষ্টে আরও কি আছে। ওগো, তোমরাই না হয় ক্ষান্ত হও। কি করি? ভগবান! তুমি আছ, না মরেছ?

কাঞ্চন। মরেছে—মরেছে! উঃ, আর পারলুম না বোন তোকে রক্ষা করতে, যদি পারিস, রণচণ্ডীর মূর্তি ধরে নিজেকে রক্ষা কর। কর—আঘাত কর, আরও—আরও, একদিনে সব জ্বালার অবসান হয়ে যাক। ভগবান! এত দুঃখও মানুষকে দিতে পার! উঃ—[ পতন ]

১ম সৈনিক। এসো শাহজাদী—

স্বর্ণময়ী। চল, যাচ্ছি; দেখি, ঈশা খাঁ তোদের পুরস্কার দেয়, না মাথাগুলো কেটে নেয়। দাদা! যদি বেঁচে ওঠ, আমার সন্ধান করো না—আমার ছায়া মাড়িয়ো না, আমার নিশ্বাসে বিষ আছে! মনে করো, আমি মরেছি—আমি মরেছি— [ সৈনিকগণ সহ প্রস্থান।

কাঞ্চন। সোনা—সোনা—

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। কই সোনা, কোথা সোনা? এ কে, কাঞ্চন? সোনা কই?

কাঞ্চন। ঈশা খাঁর সৈন্যেরা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে। কেশরীকাকা! ঈশা খাঁ কোথায় আছে বলতে পার?

কেশরী। তারা শ্রীপুর অবরোধ করেছে কুমার! শত্রু যদি প্রাসাদ

পরিণামটা কি হবে ভেবে দেখেছ? তোমার পিতাকে
হত্যা করবে, চম্পককে হত্যা করবে, মহারাণীকে সোনারগাঁয়ে নিয়ে
গিয়ে বেগমের বাঁদী করবে।

কাঞ্চন। এঁ্যা—আমার মাকে বাঁদী করবে? তবে আর মরা হলো
না কাকা! আমায় একটু তুলে ধর, রসো—একটু জল খেয়ে নিই,
তারপর ছুটে গিয়ে শত্রুসেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। চল—চল।

[ কেশরীর সাহায্যে প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

শ্রীপুর—রাজপ্রাসাদ

চাঁদ রায় ও ভবানীর প্রবেশ।

চাঁদ। রাণী—রাণী! শাঁখ বাজাও—উলু দাও! কোটিশ্বর আসছে—
সোনার বর আসছে। শুনছো না নূপুরের ধ্বনি? পদ্মগন্ধ টের পাচ্ছো
না? দেখ—দেখ, শিরে শিখিচূড়া, গলে বনমালা, পরিধানে পীতবাস;
আহা, কেমন সেজেছে বল তো?

ভবানী। কোটিশ্বর! এতখানি ব্যাকুলতার এই পরিণাম?

চাঁদ। হ্যাঁগা, তুমি কাঁদছো কেন?

ভবানী। কেন কাঁদি, তা যদি বুঝতে! হায় রাজা, কি ছিলে তুমি,
আজ কি হয়েছ, ওগো বাংলার সিংহ, তোমার দ্বারে আজ শত্রু এসে হুঙ্কার
দিচ্ছে; রাজ্য যেতে বসেছে, প্রাসাদটা অধিকার করে তারা তোমাকে শৃঙ্খ-
লিত করবে, আমাকে লুণ্ঠিত দ্রব্যের সঙ্গে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে নিয়ে যাবে;
এখনও তুমি প্রকৃতিস্থ হবে না? তবে তোমার সাধের রাজ্য ধ্বংস হোক!

কেদার রায়ের প্রবেশ।

কেদার। ধ্বংসের আর বিলম্ব নেই মহারাণী। প্রাসাদের মধ্যে বারুদ যা ছিল, সব নিঃশেষিতপ্রায়। যতক্ষণ পেরেছি, প্রতিরোধ করেছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যে শত্রু এসে প্রাসাদে প্রবেশ করবে। কি করবে মহারাজ?

চাঁদ। শঙ্খধ্বনি কর, বর আসছে।

কেদার। হায় মহারাজ, মৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছে, তবু তোমার প্রলাপের শেষ হবে না? দাদা। আমার মাথায় হাত দাও, একটিবার আমায় আশীর্বাদ কর। তোমার আশীর্বাদ পেলে আমি একা ওই বিশাল বাহিনী ধ্বংস করে ফিরে আসবো।

চাঁদ। তাই যাও কেদার, তাই যাও।　　　　　　[ প্রস্থান।

ভবানী। না দেবর, থাক, কেন যাবে এ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে? তার চেয়ে চম্পককে যদি খুঁজে আনতে পার চেষ্টা করে দেখ। কাঞ্চন তো গেছেই, চম্পকের হাত ধরে আমরা দেশান্তরী হয়ে চলে যাই।

কেদার। মহারাণী! দুর্ভাগ্য একা আসে না। সবই গেছে যখন তোমার চম্পকও থাকবে না—[ প্রস্থানোদ্যত ]

চম্পকের মৃতদেহস্কন্ধে দেবলের প্রবেশ।

কেদার। এ কি! চম্পক?

ভবানী। কে? কে?

দেবল। [ মৃতদেহ মাটিতে রক্ষা করিল ]

ভবানী। ওঃ! কোটিশ্বর—কোটিশ্বর! [ চম্পকের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িলেন ]

কেদার। এই নিষ্পাপ শিশু কার কাছে কি অপরাধ করেছিল ব্রাহ্মণ? কে এমন নিষ্ঠুর যে, এই কুসুমকোমল শিশুর গায়ে অস্ত্রাঘাত করলে?

ভবানী। আমার যাদু—আমার মাণিক—আমার সাগরসেঁচা ধন! কথা কও—কথা কও! ওরে, ওরে আমার যে আর কেউ নেই! একা একা কেন পালালে যাদু? তুমি যে আমায় ছেড়ে থাকতে পার না! কোটিশ্বর! নিষ্ঠুর! তোমার রাজ্যে এত অবিচার!

কেদার। অবিচার—অবিচার! আমি এ অবিচারের মূলে বজ্রাঘাত করবো। বল ব্রাহ্মণ! কার হাতে এ শিশু প্রাণ দিয়েছে?

দেবল। আমার হাতে।

কেদার। তোমার হাতে?

ভবানী। ঠাকুর! তুমিও বিশ্বাসঘাতক? তবে আর কি দেবর? সংসার মিথ্যা; সংসারে আগুন ধরিয়ে দাও, তারপর আমরাও চম্পকের পথে চলে যাই। হা চম্পক! আমার চম্পক—

কেদার। ব্রাহ্মণ! তোমার ভাই আমাদের সোনার সংসার ছিন্নভিন্ন করেছে, তোমাকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিলুম, তুমিও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে? যাক, ভালই হয়েছে। সোনা গেছে, কাঞ্চন গেছে, এই একটা বন্ধন ছিল, তাও তুমি ছিন্ন করেছ। এইবার সহজে মরতে পারবো, কিন্তু তোমাদের আমি বাঁচিয়ে রেখে যাবো না। কে আছ?

প্রতিহারীর প্রবেশ।

কেদার। এই পাষণ্ডের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে এসো—এখনি।

ভবানী। ব্রহ্মহত্যা!

কেদার। যাও—নিয়ে যাও।

দেবল। [ স্বগত ] দাদা! তোমার দণ্ড আমি নিলুম। আমার মৃত্যুতে তোমার অনন্ত পাপ ধৌত হোক।

[ প্রতিহারী সহ প্রস্থান।

ভবানী। ব্রহ্মহত্যা! মহারাজ চাঁদ রায়ের বংশে ব্রহ্মহত্যা! হা চম্পক—আমার চম্পক! ওরে জেগে ওঠ, নইলে ধর্ম যে রসাতলে যায়।

কেদার। বৎস! প্রাণাধিক! যাও—অমর ধামে যাও, আমরাও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। জন্মাবধি মাতৃস্তন্য পান করনি, পিতার সাদর সম্ভাষণ কোনদিন পাওনি; তাই যদি অভিমানে চোখ বুজে থাক, তবে জেনে যাও—তোমার বিরহে তোমার পিতা আর বাঁচতে চায় না।

চাঁদ রায়ের প্রবেশ।

চাঁদ। কে? কেদার? যুদ্ধে জয় করে এসেছ? তবে কাঁদছো কেন? একটা মাণিক হারিয়েছি, নয়? হারাবো না? কোটিশ্বর পালিয়ে গেছে—

ভবানী। মহারাজ! চম্পক নেই—তোমার চম্পক নেই—

চাঁদ। চম্পক নেই! মরেছে? বটে! ও আমি জানি। কোটিশ্বর পালিয়েছে, চম্পক পালাবে না? এই যে, মরেছে—না? মরবে বৈকি! তুমি কি থাকতে পার? তুমি যে চাঁদের বংশধর।

কেদার। দাদা! ওকি, অমন করে চাইছো কেন? মহারাণী! দেখছো কি? সরিয়ে ফেল—

চাঁদ। এই—খুন করবো! রাখ—রাখ বলছি! ও আমাকে গান শোনাবে, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে। সরে যা সব—সরে যা বলছি; তোরা কাছে থাকলে ও গান গাইবে না।

ভবানী। মহারাজ! দোহাই মহারাজ। তুমি যাও—

চাঁদ। চুপ! ঘুমুচ্ছে, ঘুম ভাঙিও না। এসো তো—বুকে এসো তো। [ মৃতদেহ বুকে লইয়া ] উঃ—বড় গরম, জ্বর হয়েছে। জল নিয়ে আয় কেদার, শীগগির যা। ওকে স্নান করিয়ে দিতে হবে, নইলে মরে যাবে যে! আনলি না? আয় তবে, দীঘির জলে তোকে লুকিয়ে রাখি— [ প্রস্থান।

ভবানী। রাজা! রাজা! [ প্রস্থান।

কেদার। সব গেল—সব গেল। [ প্রস্থানোদ্যত ]

কেশার মার প্রবেশ।

কেশার মা। ও কেদার! শত্রুরা ফটক ভাঙছে যে! বারুদ নেই, কি করি বল?

কেদার। মরবে এসো, সবাই মিলে একসঙ্গে তোপের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বো। কিসের ভাবনা মা! আজ আমাদেব মুক্তি—মুক্তি।

[ নেপথ্যে কামান গর্জন ]

কেশার মা। ও আবার কি?

কেদার। বিধাতার খেয়াল। এসো—এসো, যে যেথানে আছ, ছুটে এসো—আজ আমাদেব মুক্তি—মুক্তি।

কেশার মা। থাম কেদাব! আগে আমি যাবো, তুই আসবি আমার পেছনে— [ প্রস্থান।

[ নেপথ্যে কামান গর্জন ও চাঁদ রায়ের জয়ধ্বনি ]

কেদার। জয় মহাবাজ চাঁদ রায়ের জয়!

দৌবারিকের প্রবেশ।

কেদার। কি? তুমি আবার কি চাও?

দৌবারিক। মহারাজ মৃতদেহ বুকে করে দীঘির জলে ঝাঁপ দিয়েছেন।

কেদার। তার অর্থ, মহারাজ চাঁদ রায়ও নেই। বা রে ভাগ্য! বা রে বিধাতা! সবাইকে ছিনিয়ে নিয়েছ! মুক্তি—মুক্তি—মহামুক্তি।

[ প্রস্থান, পশ্চাৎ দৌবারিকের প্রস্থান।

---

# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

রণস্থল

ঈশা খাঁ ও এনায়েত।

ঈশা খাঁ। সহসা এ কি হলো এনায়েত? সামনে কামান, পেছনে কামান; আমাদের সৈন্যগুলো সব দলে দলে তোপের মুখে উড়ে যাচ্ছে। দেখ—দেখ এনায়েত, কি ভয়াল মরণোৎসব!

এনায়েত। জাঁহাপনা! আমরা যখন প্রাসাদ অধিকার করতে যাচ্ছিলুম, ঠিক সেই সময় পেছনে দু'জন হিন্দু আমাদের কামান অধিকার করে আমাদের গতি ফিরিয়ে দিয়েছে। এদিকে কেদার রায় মরিয়া হয়ে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এসেছে, তাকে দেখে সমস্ত হিন্দুসৈন্য চাঁদ রায়ের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেছে।

ঈশা খাঁ। আমি বলেছিলুম এনায়েত, যারা অন্নদাতা প্রতিপালককে পরিত্যাগ করতে পারে, তাদের বিশ্বাস করো না। তুমি আমায় ভুল বোঝালে। এখন এসো, সবাই মিলে হাত পা গুটিয়ে মরি।

এনায়েত। হতাশ হয়ো না ঈশা খাঁ!

ঈশা খাঁ। হতাশ হবো না? প্রাণের আশা এখনও আছে তোমার এনায়েত? সম্মুখে কামান, পশ্চাতে কামান, মাঝখানে আমরা মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে কি করবো এনায়েত? আমরা মরি, তাতে দুঃখ ছিল না; কিন্তু অতগুলো সৈন্যকে নদীর পারে টেনে এনে এইভাবে হত্যা করা —ওঃ, এনায়েত! এ যে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা!

এনায়েত। আমি যাচ্ছি বন্ধু! যেমন করে হোক, পেছনের কামান শত্রুর হাত হতে ছিনিয়ে আনবো।

ঈশা খাঁ। যাও এনায়েত! যদি পার, তবু একটা পথ খোলা থাকবে। আমি যাচ্ছি কেদার রায়কে সম্ভাষণ করতে। যদি মরি, তোমার উপর আমার এই আদেশ রইলো এনায়েত, সোনার সম্বন্ধে কোন দুরভিসন্ধি মনের কোণেও স্থান দিও না।

এনায়েত। সৈন্যদের কি করেছ?

ঈশা খাঁ। যারা সোনাকে নিয়ে এসেছে? তোমার সেই বন্ধুদের আমি চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি।

এনায়েত। জাঁহাপনা—

ঈশা খাঁ। দুঃখিত হলে কি করবো বন্ধু! ঈশা খাঁ মরবে, তবু লম্পট নাম নেবে না। [ প্রস্থান।

এনায়েত। আমি দেখবো ঈশা খাঁ, কেমন তুমি সাধু!

রুধিরাক্ত অবসন্ন দেহে কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। সোনা—সোনা! নাঃ—আর দেখা হলো না। এই তো শেষ! এই তো শেষ! চোখে অমাবস্যার অন্ধকার, মাথায় বিশ্বের ভার নেমে আসছে। ভগবান! তোমায় কখনো ডাকিনি; আজ মরণের তীরে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে তুমি আছ। দয়াল! দীনবন্ধু! তোমারই অফুরন্ত করুণার দ্বারে আমার অভাগিনী বোনটিকে রেখে গেলুম; সংসারে ওর কেউ নেই, তুমি ওকে দেখো!

এনায়েত। কে? কে?

কাঞ্চন। আমি মরণপথের যাত্রী। দেখ, পিপাসায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে; আমায় একটু জল দিতে পার? বড় তৃষ্ণা—বড় তৃষ্ণা!

এনায়েত। জল দেবো? হুঁ, দিচ্ছি। কাঞ্চন! আলেয়া কোথায়?

কাঞ্চন। কে আলেয়া?

এনায়েত। চেনো না? শাহজাদী আলেয়া—

কাঞ্চন। জানি না।

এনায়েত। মিথ্যা কথা।

কাঞ্চন। কেদার রায়েব পুত্র মরতে জানে, মিথ্যা বলতে জানে না।

এনায়েত। বাচালতা রাখ যুবক! তোমাকে এতক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছি, শুধু শাহজাদীর সংবাদের জন্য। বল, সে কোথায়? নইলে এই দণ্ডেই তোমার শিরশ্ছেদ করবো।

আলেয়াব প্রবেশ।

আলেয়া। খবরদার!

এনায়েত। কে?

আলেয়া। আমি—শাহাজাদী, যার জন্য তোমরা বিশাল বাহিনী নিয়ে শ্রীপুরের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছ, যার জন্য সোনাকে তার সুখের বিবর থেকে টেনে এনেছ, আর এই বীর যুবককে এমনি করে মৃত্যুর পথে এনে দাঁড় করিয়েছ। ছিঃ এনায়েত খাঁ! মুমূর্ষুর কাঁধের উপর তরবারি তুলতে লজ্জা করে না? এই বুঝি তোমার বীরত্বের পরিচয়?

এনায়েত। আলেয়া!

আলেয়া। হুঁশিয়ার বেয়াদব! শাহজাদী বল—

কাঞ্চন। শাহজাদী—

আলেয়া। ভাই! ভাই! মরতে চলেছে? তাই ভাল—তাই ভাল; এ সংসারে অনেক জ্বালা। আমাদের জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছ ভাই! মৃত্যুর শীতল কোলে তোমার সকল জ্বালার শান্তি হোক!

কাঞ্চন। ভগিনী! মরার আগে আমার সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করে যাচ্ছি। শুধু একটা কামনা আমার পূর্ণ কর বোন!

আলেয়া। বল ভাই, কি চাও তুমি?

কাঞ্চন। দিদি! আমার অভাগী বোনটির জন্যই আমার প্রাণ বেরুতে চায় না। কি যে দুঃসহ যন্ত্রণা এই দেহের প্রতি রোমে, তোমায় বোঝাতে পারছি না। সোনা আমার একা রইলো; ভগবানের হাতে তাকে সঁপে দিয়েও আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। দিদি! তুমি যদি তার ভার নাও, আমি শান্তিতে মরতে পারি।

আলেয়া। তোমার ভগবানের চেয়েও তুমি আমায় বিশ্বাস কর? তবে তাই হোক ভাই! আমি এ বিশ্বাসের অমর্যাদা করবো না। যতদিন আমি জীবিত আছি, ততদিন সোনা নিষ্কণ্টক।

কাঞ্চন। তোমার মঙ্গল হোক। ওই যে সোনা—ওই যে সোনা বাতায়নপথে আমার দিকে চেয়ে আছে। সোনা—সোনা—

[ স্খলিতচরণে প্রস্থান।

আলেয়া। কুমার—[ প্রস্থানোদ্যতা ]

এনায়েত। দাঁড়াও।

আলেয়া। কি?

এনায়েত। আমি তোমার উপর অন্যায় সন্দেহ করেছিলুম; আমায় ক্ষমা কর আলেয়া!

আলেয়া। তোমার মত জানোয়ারকে ক্ষমা করলেই বা কি, আর না করলেই বা কি! আমার দেবতার মত ভাই, তার মাথাটা তুমিই চিবিয়ে খেয়েছ। তুমিই তাকে বুঝিয়েছ কাঞ্চন আমাকে ফুসলে এনেছে; তাই এত সৈন্যক্ষয়। কেন, কিসের এত গায়ের জ্বালা তোমার? কি চাও তুমি?

এনায়েত। আমি চাই তোমাকে।

আলেয়া। কি? তুমি আমাকে চাও? কামান্ধ পশু—

এনায়েত। ধীরে শাহজাদী—ধীরে। এই কামান্ধ পশুকেই তোমায় আলিঙ্গন করতে হবে।

আলেয়া। এনায়েৎ খাঁ! তোমার সাহস তো খুব! তুমি আমাকে চেনো না? ঈশা খাঁকে চেনো না?

এনায়েত। চিনেছি বলেই তোমার এত কাছে এগিয়েছি বন্ধু! নইলে এনায়েত খাঁ পরনারীর দিকে স্বপ্নেও লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। এসো আলেয়া, আমি তোমার সব অভিযোগ মেনে নিচ্ছি। আমায় বিশ্বাস কর। একদিন আমি যেমন মানুষ ছিলুম, আবার তেমনি মানুষ হতে চাই। এসো—তুমি আমার ভার নাও—[ হস্তধারণ ]

আলেয়া। হাত ছাড় লম্পট! ঈশা খাঁ! দেখে যাও তোমার বিশ্বস্ত বন্ধুর ব্যবহার!

এনায়েত। কোন ফল নেই শাহজাদী! ঈশা খাঁ এখানে এলে তোমাকে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে তুলে দেবে। নারী! তুমি দীর্ঘকাল আমাকে পশুর আসনে বসিয়ে আমার উপর অবজ্ঞার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেছ, আমি প্রতিবাদ করিনি। আজও তোমার এই সহস্র ব্যঙ্গোক্তির প্রতিদানে আমি তোমায় একটুও অভিযোগ করবো না। শুধু একটা কথা শুনে যাও শাহজাদী! যতই হেয় হোক, এই কামান্ধ লম্পট পশুই তোমার স্বামী।

আলেয়া। কি? কি? কে তুমি?

এনায়েত। আমি জয়সিংহ, আর তুমি আমার স্ত্রী সত্যবতী।

আলেয়া। উঃ! খোদা—খোদা! এর চেয়ে আমার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ দিলে না কেন? সারা জীবন আশাপথ চেয়ে বসে আছি কি

এই স্বামী পাবার জন্য? ফিরিয়ে নাও—তোমার বর ফিরিয়ে নাও ঈশ্বর! [ প্রস্থান।

এনায়েত। বা রে নারীচরিত্র—বাঃ!

[ প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থলের অপরাংশ

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। সংসারটা প্রহেলিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঈশা খাঁ সোনাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলে; ঈশা খাঁর বোন আলেয়া—সেও আজ শত্রুকে আপনার বলে গ্রহণ করেছে। মূর্খ দেবল—সংসারের আবর্জনা বলে যাকে দু'পায়ে মাড়িয়েছি, সে আজ আমার জন্য প্রাণ দিলে! কোথা যাই—কোথায় পালাই? কুষ্ঠব্যাধির চেয়েও এ অন্তর্দাহ যে দুঃসহ!

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। কে? গুরু শ্রীমন্ত নয়? ঠিক হয়েছে, আজ তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। সেদিন বিধর্মীর হাত থেকে তোমায় রক্ষা করেছিলুম বলে মনে করো না যে তোমায় রক্ষা করেছি। আজ আমাদের মরণের দিন; কিন্তু মরবার আগে তোমার ভবলীলা শেষ করে যাবো।

শ্রীমন্ত। তাই কর; বাঁচবার সাধ আর আমার নেই।

কেশরী। কেন? ঈশা খাঁর মোসাহেবী করে ইমারত গড়বে না?

শ্রীমন্ত। ভুল কেশরী! সব ভুল। দেবল আমায় বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, ত্যাগেই প্রকৃত শান্তি। যে চাঁদ রায়কে অবলম্বন করে আমার অন্তরের বহ্নি-জ্বালা এতখানি পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল, সে চাঁদ রায় আজ আর নেই।

কেশরী। চাঁদ রায় নেই?

শ্রীমন্ত। না; আমারই অত্যাচারে সে তিলে তিলে শুকিয়ে মরেছে। তবু মৃত্যুর পূর্ব্বে একটা অভিশাপও আমায় দিয়ে যায়নি! আমি গোখরো সাপের মত সবাইকে দংশন করেছি, তবু তারা আমার মুখে দুধের বাটি তুলে ধরেছে। একি সয় কেশরী? তার উপর এই নিদারুণ কুষ্ঠব্যাধি—নাঃ, এর চেয়ে মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। কর—হত্যা কর।

কেশরী। তবে সোজা হয়ে দাঁড়াও। ব্রাহ্মণ! তোমার সব অত্যাচার হয় তো ক্ষমা করতে পারতুম, কিন্তু তুমি আমাদের প্রজাবৎসল দয়ালু রাজাকে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিয়েছ, তোমার এ অপরাধ আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না।

শ্রীমন্ত। তার উপর আরও একটা আছে, আমি রাজকুমার চম্পককে হত্যা করেছি—

কেদার রায়ের প্রবেশ।

কেদার। কে? কে? চম্পককে হত্যা করেছে কে?

শ্রীমন্ত। আমি।

শ্রীমন্ত। এঁ্যা—সে কি! আমি যে দেবলের শিরশ্ছেদ করে এসেছি; তুমি—তুমি কে? ব্যাধিজর্জরিত ধূলিধূসরিত—ও, তুমি শ্রীমন্ত না? পেয়েছি—পেয়েছি। ব্রাহ্মণ! তোমার জন্য আমি ভাই হারিয়েছি—পুত্র হারিয়েছি—রাজ্য ধন মান সব ডালি দিতে বসেছি। আমরা তো মরবোই, কিন্তু তোমাকেও জীবিত রেখে যাবো না। তুমি শুধু

আমাদেরই সর্বস্বান্ত করনি, নিজের ভাইকেও যমালয়ে পাঠিয়েছ। সেই সরল ব্রাহ্মণ—ওঃ, কি করেছি—কি করেছি!

শ্রীমন্ত। কেদার!

কেদার। দাঁড়াও; কি শাস্তি তোমায় দেবো, ঠিক ভেবে উঠতে পারছি না। এমন শাস্তি তোমায় দিতে হবে, যেন তোমার এক ফোঁটা রক্ত—একটি অস্থিও পৃথিবীর মাটি স্পর্শ না করে।

শ্রীমন্ত। দাও—শাস্তি দাও কেদার, আজ আর আমার কোন অভিযোগ নেই।

কেশরী। অভিযোগ? এতখানি পাপ করেও আবার অভিযোগের কথা তুলছো ঠাকুর? দাদা! কেন বিলম্ব করছো? ওই দেখ, আমার হাত থেকে কামান অধিকার করে ঈশা খাঁর সৈন্য আবার রুখে দাঁড়িয়েছে। যা হয়, শীঘ্র কর।

কেদার। হ্যাঁ, একটা কিছু করতে হবে। কি করবো, ভেবে উঠতে পারছি না। তোমার জন্য দাদা গেছে, সোনা গেছে, চম্পক পালিয়েছে—

দূতের প্রবেশ।

কেদার। তুমি আবার কার মৃত্যুসংবাদ এনেছো? মহারাণীর? বল—বল, একটুও বিস্মিত হবো না। বল দূত, কে মরেছে আর?

দূত। কুমার কাঞ্চন।

কেশরী। ওঃ—কাঞ্চন—কাঞ্চন! দাদা! এর জন্য আমি দায়ী। আমিই তাকে রুধিরাক্ত অবসন্নদেহে যুদ্ধে টেনে এনেছিলুম, সেই অবসন্ন-দেহেই সে শত্রুর হাত থেকে কামান কেড়ে নিয়ে এতবড় বাহিনীর গতি ফিরিয়ে দিয়েছিল। ওঃ—সে কি যুদ্ধ দাদা! যদি দেখতে, বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকতে।

কেদার। যাও দূত, মহারাণীকে সংবাদ দাও। [ দূতের প্রস্থান। আনন্দ কর—আনন্দ কর! কেদার রায়ের ছেলে বীরের মত প্রাণ দিয়েছে। বিষ খেয়ে মরেনি, অসংখ্য শত্রুর মৃতদেহের উপর পুষ্পশয্যা পেতেছে! কি আনন্দ—কি আনন্দ কেশরী! এক দিনে সব শেষ!

কেশরী। দাদা! এই সব অনর্থের মূল এই ব্রাহ্মণ।

কেদার। হত্যা কর—নির্ম্মম হত্যা! আগে চোখ দুটো উপড়ে ফেল, তারপব গায়ের চামড়া তুলে নিয়ে গোখরো সাপ দিয়ে দংশন করাও।

কেশরী। এসো ঠাকুর—[ শ্রীমন্তকে লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ ]

কেদার। না, দাঁড়াও; এতবড় পাপের এতটুকু শাস্তি তোমায় দেবো না। এর চেয়ে কঠিন শাস্তি চাই, যাতে সারাজীবন তোমার অন্তরাত্মা নিত্য হাহাকাব করে ওঠে। চাঁদ রায় বেঁচে থাকলে তোমায় যে দণ্ড দিতেন, আমিও তোমায় সেই দণ্ড দেবো। যাও ব্রাহ্মণ! এতখানি অত্যাচাবের বিনিময়ে আমি দিলুম তোমায় ক্ষমা।

[ প্রস্থান।

কেশরী ও শ্রীমন্ত। ক্ষমা?

কেশরী। কিন্তু আমি তোমায় ক্ষমা করবো না। এসো ঠাকুর, আমারই বিধানে তোমার ভবলীলা শেষ হোক।

শ্রীমন্ত। কোটিশ্বর! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

[ শ্রীমন্তকে লইয়া কেশরীর প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদতোরণ

ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। কাঞ্চন! কাঞ্চন!

কেশার মার প্রবেশ।

কেশার মা। কোথায় যাচ্ছ বৌমা?

ভবানী। ছাড় মা—ছাড়, কাঞ্চনকে নিয়ে আসি। অভিমানী ছেলে দুর্জয় অভিমানে ধুলিশয্যায় পড়ে আছে। ও মা, দোহাই তোমার! আমায় ছেড়ে দাও, আমি ছুটে গিয়ে তাকে নিয়ে আসি—

কেশার মা। কাকে আনবে মা? হাজার ডাকলেও সে আর সাড়া দেবে না।

ভবানী। না—না, তুমি জান না। সে কি আমার তেমন ছেলে? অর্ধদগ্ধ অবসন্নদেহে সে আমার ডাকে ছুটে এসেছিল। ছাড়ো মা—ছাড়ো, কেন বাধা দিচ্ছ?

কেশার মা। আর যে কোন উপায় নেই মা!

ভবানী। কে বলে উপায় নেই? আমি যাবো, দেখি, কার সাধ্য আমার গতিরোধ করে!

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। রাণী-মা—রাণী-মা! এই তোমাদের পরম শত্রুর ছিন্নশির!
[ শ্রীমন্তের ছিন্নশির ফেলিয়া দিল। ]

ভবানী। সরে যাও!

কেশরী। কোথায় চলেছ রাণী-মা?

ভবানী। কাঞ্চনকে নিয়ে আসছি, সর—সর!

কেশরী। কাঞ্চনকে নিয়ে আসবে? হায় মা! যম যাকে নেয়, তাকে যে আর ছেড়ে দেয় না।

নেপথ্যে। জয় সুলতান ঈশা খাঁর জয়!

কেশরী। জয় মহারাজ চাঁদ রায়ের জয়!

কেদার রায়ের প্রবেশ।

কেদার। আবার বল—আবার বল, জয় মহারাজ চাঁদ রায়ের জয়। কেশা! মরতে পারবি?

কেশরী। কেন পারবো না দাদা?

কেদার। তবে আয়, দুজনে তোরণদ্বার আগলে দাঁড়াই; দেখি, কে এমন শক্তিমান যে আমাদের হটিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করে!

ঈশা খাঁ ও এনায়েতের প্রবেশ।

ঈশা খাঁ। আমি।

কেদার। ঈশা খাঁ! কেদার রায়ের শক্তির পরিচয় পাওনি?

ঈশা খাঁ। পেয়েছি; তুমিও পাবে আজ ঈশা খাঁর শক্তির পরিচয়। সহজে দ্বার খুলে দাও কেদার রায়! নইলে তুমি আমার বন্দী।

কেদার। দন্তে তৃণ ধারণ করে ফিরে যাও ঈশা খাঁ, নইলে তুমি আমার বধ্য।

এনায়েত। তবে চলুক অস্ত্র—

কেশরী। চলুক লাঠি—

ঈশা খাঁ। কেদার রায়!

কেদার। ঈশা খাঁ!

দুই পক্ষ যুদ্ধোন্মুখ হইয়া দাঁড়াইল, সহসা
আলেয়া আসিয়া মধ্যে দাঁড়াইল।

আলেয়া। সন্ধি।

ঈশা খাঁ ও এনায়েত। আলেয়া!

কেদার ও কেশরী। শাহজাদী!

আলেয়া। সন্ধি কর, না হয় দুই পক্ষের সংঘর্ষে আমি আগে প্রাণ দিই, আমার মৃতদেহ মাঝখানে রেখে তোমাদের জয়-পরাজয় নির্ণীত হোক।

ঈশা খাঁ। তুমি যে ভগ্নী—আদরের দুলালী আমার!

কেদার। তুমি যে মা—অতিথির বেশে নারায়ণ।

আলেয়া। তবে ফেলে দাও অস্ত্র! [ দুই পক্ষ মন্ত্রমুগ্ধের মত অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া দিল। ] ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, একই অক্ষয় বটের দুটি শাখা তোমরা, একই বাংলা মায়ের দুটি সন্তান তোমরা হিন্দু-মুসলমান, একজনের গায়ে বিস্ফোটক হলে আর একজনকে বিষের জ্বালা সইতে হয়, একের ঘরে আনন্দের স্রোত এলে অপরকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়—তবু তোমরা এমনি করে নিজের মাংস নিজে কামড়ে খাবে? তোমরা তো বনের পশু নও, তোমরা তো ক্রিমিকীট নও! তোমরা মানুষ, তোমরা বীর, তোমাদের ভ্রাতৃস্নেহের অমৃতধারায় বাংলার মাটি সরস হয়ে উঠুক—হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শক্তিতে বাংলায় একটা মহা-মানবের জাতি গড়ে উঠুক!

ঈশা খাঁ। তাই হোক ভগ্নী! তোমার জন্যই আমার এ অভিযান। তোমাকে যখন পেয়েছি, আর আমি যুদ্ধ করবো না।

কেশরী। জয় রাজা কেদার রায়ের জয়!

এনায়েত। জয় সুলতান ঈশা খাঁর জয়!

আলেয়া। না—না, বল, জয় বাংলা মায়ের জয়!

কেশরী ও এনায়েত। জয় বাংলা মায়ের জয়!

স্বর্ণময়ীর প্রবেশ।

স্বর্ণময়ী। দেখতে এলুম শ্মশানের বহ্নিজ্বালায় উৎসবের বাঁশী কেমন বেজে উঠেছে।

ভবানী। সোনা—সোনা—

আলেয়া। না মা, আর মায়া বাড়িও না; ও আর তোমাদের নয়, আজ হতে ও আমার। এসো বোন আমার সঙ্গে, আমরা দুই-জনে মিলে দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য অশ্রুর দরিয়া বইয়ে দিই এসো! আমি ডাকবো খোদাকে, আর তুমি ডাকবে তোমার ভগবানকে; দেখি, খোদা আব ভগবান হাত ধরাধরি করে এসে আমাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়ায় কি না! [ স্বর্ণময়ীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল। ]

এনায়েত। আলেয়া!

আলেয়া। এ জন্মে আর নয় স্বামী! ফিরে যাও তুমি আরাবল্লীর পাদদেশে। তোমাব এ হিংস্র স্বভাব এ জন্মের সাধনায় দূর কর, পরজন্মে আমি তোমার ক্রীতদাসী হয়ে থাকবো।

[ স্বর্ণময়ী সহ প্রস্থান।

এনায়েত। পরজন্মে নয়, এ জন্মেই আমি তোমাকে চাই! বিদায় জাঁহাপনা! আমার পৃথিবী এক দিকে, আর আলেয়া এক দিকে—

[ তরবারি রাখিয়া প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। কেদার রায়! সোনাকে তোমাদের বুক থেকে ছিনিয়ে

নিয়ে ঘরছাড়া করেছি, তার প্রতিদানে আমার ভগ্নীকে বিসর্জন দিলুম ; এইবার আমায় বন্ধু বলে গ্রহণ কর।

কেদার। তাই হোক ঈশা খাঁ। আজ হতে আবার আমরা পরস্পরের বন্ধু। এসো বন্ধু, আমার পুত্রের শবযাত্রার অনুগমন করতে আমি তোমায় নিমন্ত্রণ করছি— [ ঈশা খাঁ ও কেশরী সহ প্রস্থান।

ভবানী। সোনা—সোনা—

কোটিশ্বরের বিগ্রহ লইয়া সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন। এই নাও মহারাণী! তোমার কোটিশ্বর—

গীত।

ওমা, প্রণাম কর—প্রণাম কর।
সকল দাগা জুড়িয়ে যাবে, এই রতনে জড়িয়ে ধর॥
যতই দুঃখ পেয়ে থাকিস, সবই আছে গোনা,
সওয়ার গুণে সেই ধূলো তোর হতেই হবে সোনা,
মা গো, তোমার চোখের ধারায় বিশ্বজগৎ আপন হারায়,
ওমা মরবে যদি সবাই মিলে এই সাগরে ডুবে মর॥

[ প্রস্থান।

ভবানী। কোটিশ্বর। কোটিশ্বর! এসেছ তুমি? আমায় সর্বস্বান্ত করে ফিরে এসেছ? এসো—এসো দয়াল! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

[ কোটিশ্বরের বিগ্রহ বুকে করিয়া প্রস্থান।

---

## পদ্মদীঘির মেয়ে

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসাক রচিত কাল্পনিক নাটক। দারিদ্র্যতাই বোধহয় মানুষের সবচেয়ে চরম অভিশাপ। এ নাটকের নায়ক মদনলাল সেই চাপে পড়ে যাত্রা করেছিল এক পাপপথে; কিন্তু নায়িকা পদ্মদীঘির মেয়ে কুন্তলা কি ভাবে সেই পাপের পথ থেকে মদনকে ফিরিয়ে আনলো তারই অভিনব আলেখ্য। এতে দেখবেন—ডালিয়ার দ্বিমুখী সংঘাত, শঙ্কর ও মোহিনীর স্বর্গীয় প্রেম, নেপথ্য চরিত্র মোহর ডাকাতের ভয়াবহ বিভীষিকা—সবকিছু মিলে নির্য্যাতিত বুভুক্ষু মানবাত্মার এক রহস্যময় নাটক "পদ্মদীঘির মেয়ে"। অল্পলোকে সহজে জমজমাট নাটক।

## চাবুক

শ্রীঅনিল দাসের সামাজিক নাটক। দেশের শ্রমিক-কৃষক কুলী-মজুর অন্নাভাবে হাহাকার করে শুকিয়ে মরে, আর অন্যদিকে তাদের বুকের উপব ধনিক-গোষ্ঠী চালায় অত্যাচার ও অবিচারের চাবুক। তারপব? তাবা কি অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে গর্জ্জে ওঠে না? অত্যাচারীর দেহের রক্তে তুফান বইয়ে দিতে পাবে না? নিষ্পেষিত অত্যাচারিত দেশবাসীর সেই শক্তির জলন্ত প্রমাণ দেবে এই 'চাবুক' নাটকে।

## মৃত্যুর চোখে জল

দেবেন নাথ প্রণীত অভূতপূর্ব্ব সামাজিক নাটক। অম্বিকা নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত। অনস্বীকার্য্য অপত্য স্নেহকে অস্বীকার করতে গিয়ে আভিজাত্য নরেন্দ্র নাবায়ণ পুত্র শঙ্কর নারায়ণকে করলো ত্যাজ-পুত্র। স্ত্রী চন্দ্রাব হাত ধরে এসে দাঁড়াল পথে বাঁচবার আগ্রহ নিয়ে। কিন্তু ক্ষুধা আর উপবাসের সঙ্গে লডাই করতে গিয়ে বাঁচতে সে পারে নি। মিথ্যা আভিজাত্যের কাছে যখন স্বামী প্রেমে উপবাসী বুভুক্ষু মন নিয়ে চন্দ্রা এসে কৈফিয়ৎ চাইল—কে দায়ী তার এই নিঃস্বতার জন্য, নরেন্দ্র নারায়ণ কি পেরেছিল তার জবাব দিতে? ইদানীং কালে যতগুলি সামাজিক নাটক প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

## স্বামীর ঘর

ব্রজেন্দ্র কুমার দে প্রণীত সামাজিক নাটক। ধনীর দুহিতা সতীর স্বামি-সেবাব্রতে অবজ্ঞা ও পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ। ঐশ্বর্য্যবিলাসের বিকর্ণের জন্ম। দশ বৎসর পরে পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ।

## এক মুঠো আগুন

শিবাজী রায় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। এক মুঠো অন্ন থেকে যারা মানুষকে বঞ্চিত করেছে, তাদের মুখে কে দেবে এক মুঠো আগুন? এই প্রশ্ন, এই জিজ্ঞাসা। ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়কে কেন্দ্র করেই এই নাটক। ভাষা, ভাব ও কাহিনী এতই মধুর যে, পড়তে আরম্ভ করলে শেষ পাতা পর্য্যন্ত রুদ্ধশ্বাসে পড়তে হবে। অভিনয় দেখতে গেলে যবনিকা পর্য্যন্ত না দেখে তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

## সম্রাট নাদিরশাহ্

শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। দরিদ্র এক চাষার ছেলে হ'লো প্রজাপালক আদর্শবাদী সম্রাট। কেন? কি তার কারণ? কার সে প্ররোচনা—উত্তেজনা? আবার কেনই ব' সেই মরমী দেশপ্রাণ সম্রাট পরিণত হ'লো এক অত্যাচারী নিষ্ঠুর নরঘাতক নৃশংস দস্যুতে? এই মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে এবং মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের কারণ নির্দ্দেশেই এই নাটক। এর প্রতিটি চরিত্রের ক্রমপুষ্টি, সহজ সংলাপ, অভিনেতা ও দর্শকের প্রাণে বিস্ময় জাগায়।

## রক্ত দিয়ে গড়া

ভৈরববাবুর ঐতিহাসিক নাটক। দুর্দ্ধর্ষ মোগল শক্তির অত্যাচারে সোনার বাংলার বুকে একদিন নেমে এসেছিল দুর্য্যোগের ঘনঘটা। হত্যায়, লুণ্ঠনে সৃষ্টি করেছিল বিভীষিকাময় সন্ত্রাস। বয়ে গিয়েছিল রক্তের প্লাবন, নির্য্যাতিত নারীর বুকফাটা আর্ত্তনাদে বাংলার আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠেছিল, তাতে ইন্ধন দিয়েছিল এই বাংলারই কয়েকজন সমাজপতি। তবু বাঙালী তাদের রক্ত দিয়ে গড়া বাংলাকে মোগলের অধীনস্থ হতে দেয়নি। কে সেই দস্যু—যার অসীম বীরত্বে মোগলশক্তি সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত? ইতিহাস অবলম্বনে আজ পর্য্যন্ত বহু নাটক প্রকাশিত ও অভিনীত হয়েছে, এ রকম রোমাঞ্চ, আবেগ, শিহরণ ও অশ্রুসজল নাটক বোধহয় এই সর্ব্বপ্রথম!

## কণ্ঠহার

গৌর ভড় প্রণীত বিয়োগান্ত নাটক। ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে লিখিত দুটি তরুণ-তরুণীর জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী কণ্ঠহারের পশ্চাতে দুঃখের পর দুঃখে কূট ষড়যন্ত্রে, ভালবাসার আত্মদানে, স্নেহ ও সরলতার গঙ্গা-যমুনায়, মহানুভবতা ও ত্যাগের মহত্ত্বে সর্বশেষে কে পেল এই কণ্ঠহার? সৌখীন সম্প্রদায়ের উপযোগী।